দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদিনে উক্ত মূর্ত্তিত্রয় দর্শন করিলে অনেক পুণ্য সঞ্চিত হয়। খড়দহের বৈষ্ণব মন্দিরের অদূরে ২৪টী শিব-মন্দির আছে।

খড়দহে জুতার ক্রস্ ও ইঁট বহুল পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নব স্মৃতি।

মৃত-সঞ্জীবনী তোমার রাগিণী
মানস-তটিনী-তট উছলিয়া,
নব অনুরাগে বিনোদ সোহাগে
কোন্ শুভযোগে উঠিল বাজিয়া!
উঘারিয়া দ্বার হৃদয়ে আমার
প্রেমের ভাণ্ডার আছিল কি খোলা!
অলিকুল গুঞ্জে কুসুমের পুঞ্জে
পরাণের কুঞ্জে দি'ছিল কি দোলা?

বুঝি শুভ খনে অন্তর-গগনে
কবে কোন্ দিনে জ্যোছনা ফুটিল;
তরল সুধার শশীটি আমার
পরি তারা-হার হাসিয়া উঠিল!
নাচিয়া কাঁদিয়া তাপিত এ হিয়া
দিনু কি সঁপিয়া চরণে তোমার?
মধুর বচনে তোষিয়া যতনে
নি'ছিলে কি টেনে দীন-উপহার?

এ ক্ষীণ যৌবনে কবে কোন্ খনে
তোমার স্পন্দনে ডেকেছিল বান?
তুমি কি হে বঁধু, লুঠেছিলে মধু,
এসেছিলে শুধু শুনিয়া আহ্বান?
বসন্তের গানে তোমার মিলনে
ভাঙা এই বীণে বেজেছিল সুর?
আজি কোথা তুমি, হে হৃদয়-স্বামী,
ভাবি দিন-যামী কোথা—কতদূর!

আজি যে লাঞ্ছিত, ওগো ও বাঞ্ছিত,
হইয়া বঞ্চিত তব অনুরাগে;
আজি মম বীণা বাজে না বাজে না
প্রেমের মূর্চ্ছনা ললিত সোহাগে।
সুপ্ত এ জীবন, লুপ্ত ত্রিভুবন,
অলির গুঞ্জন থামিয়া গিয়াছে;
কোকিল-কাকলি পাপিয়ার বুলি
থেমেছে সকলি,—কলরব আছে!

দূরে—বহুদূরে লহরে লহরে
শুভ নব সুরে বাজিতেছে বাঁশী;
সুধা-তান তা'র শ্রবণে আমার
মথিয়া আঁধার আসিতেছে ভাসি!
আজি মনে পড়ে, নিকুঞ্জ-কুটীরে
বিনোদ বাহারে গেয়েছিনু গান;
আজি মনে পড়ে, বঁধুয়ার তরে
উঠেছিল সুরে আকুল আহ্বান!

পুনঃ বিনোদন! কর আগমন,
না-হয় যৌবন গেছে ফুরাইয়া;
যা' আছে এ ঘরে দিব তা' তোমারে,
এস হে অন্দরে আলো বিথারিয়া।
তোমার—তোমার, আমি যে তোমার!
কবে একবার দিছি ফিরাইয়া;
ওহে ভুলে যাও, আসিয়া দাঁড়াও,
সযতনে দাও ব্যথা মুছাইয়া।

জয়বেশ।

মহাত্মা যিশু ও তাপস হোসেন মনসুরের জীবনে সাদৃশ্য।

ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায়, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্ত সাধু মহাত্মগণ ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল নূতন সত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল সত্যের প্রচার-কালে তাঁহারা কি কঠোর উৎপীড়নই না সহ্য করিয়াছিলেন!

মহাত্মা যিশুর জীবন-চরিতে দেখিতে পাই, তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি বিতাড়িত হইয়াছেন, প্রলোভনের সঙ্গে কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অবশেষে "মানব ঈশ্বরের সন্তান" এই নবসত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ হইয়া কণ্টক-মকুট মস্তকে ধারণ করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন!

মহাত্মা যিশুর ন্যায় মুসলমান তাপস হোসেন মনসুরও "অনল্ হক্" (আত্মাই ব্রহ্ম অর্থাৎ আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত) এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া, নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া অবশেষে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-পদ, কর্ত্তিতজিহ্ব ও উৎপাটিত-চক্ষু হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই দুই মহাত্মার ধর্ম্মজীবনে এই একই আশ্চর্য্যজনক ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাত্মা যিশু নরনারীর পাপ, মোহ ও অজ্ঞানতার কণ্টক সর্ব্ব অঙ্গে ও মস্তকে ধারণ করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন। তাহাতেই মানব পরিত্রাণের সমাচার পাইল; অজ্ঞানতা দূর হইল; মানব ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইল। তখন মানব যিশুর নব সত্য লাভ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

মহাত্মা হোসেন মনসুরও যিশুর ন্যায় অনল হক্ "আত্মাই ব্রহ্ম" এই নব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া রাজাদেশে তীক্ষ্ণ শূলাগ্রে কর্ত্তিত-প্রত্যঙ্গ হইয়া ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিলেন,—"হে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, তুমি ইহাদিগকে কৃপা কর। এ দেহ কিছুই নয়, আত্মাই সর্ব্বস্ব, সেই স্থলেই তোমার প্রকাশ;—আত্মাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না। আমার হস্ত, পদ, চক্ষু সকলই যাইল; জিহ্বাও এখনি যাইবে, কিন্তু প্রাণ আমার তথাপি বলিবে 'অনল হক্ (অহং ব্রহ্ম)।" এই বলিতে বলিতে তাঁহার জীবন শেষ হইল।

দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; বলিল, "আমাদের কি ভ্রম! আমরা ইহাকে অবিশ্বাসী কাফের বলিয়াছিলাম। ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-বিশ্বাসী। স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার মুখ হইতে "অহং ব্রহ্ম" (অনল হক্) এই মন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভ্রমে পতিত হইয়া ইহার অর্থ বুঝিতে সমর্থ হই নাই। আজ ইনি জীবন দান করিয়া এই নব মহাসত্য মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন যে, শরীর কিছুই নয়; আত্মাকে জান; আত্মাতেই ব্রহ্ম অবস্থিত; আত্মাই আমি; 'অনল হক্'।"

শ্রীমতী—

আত্মার অমরত্ব।

কত অণু-পরমাণু-গঠিত শরীর,
রক্ত-মাংস-মেদ-পূর্ণ হয়েছে দেহীর!
চক্ষু কর্ণ নাসিকা সে সুন্দর বদন,
উজ্জল লাবণ্য-রাশি মুগ্ধ করে মন!
অমিয় বচন-রাশি শ্রবণ জুড়ায়,
মানুষ সুন্দর রূপে জগৎ মাতায়!
হেন দেহে মানবের কতই যতন,
তিলেক হইলে ত্রুটি ভাবে অনুক্ষণ!

হেন দেহে সুখ-তৃষ্ণা অসীম ধরায়;
বল দেখি ক'দিনের সেই সমুদায়?
ধন-মান-পুত্রে লোক বিপুল আশায়—
বাহ্য সে অনিত্য সুখে, উন্মত্ত ধরায়;
কিন্তু হায়, অন্তরের আত্মা যায় ভুলে!
সকলি অসার কার্য্য;—ভ্রম দেখি মূলে!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

অদৃষ্টলিপি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রমাকান্ত চলিয়া যাইলে ভুবনেশ্বরী সমস্ত বাড়ী অন্ধকার দেখিতে লাগিল। সব চেয়ে তাহাদের শয়নগৃহে বড়ই শূন্যতা বোধ হইল। যেখানে 'চেয়ারে'র উপরে রমাকান্ত বসিতেন, যেখানে বসিয়া পত্নীর সহিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মের কথা, কর্ম্মাকর্ম্মের কথা, দেশের কথা, সংবাদপত্রের মর্ম্মকথা, নিজেদের আশা-ভরসার কথা বলা-বলি করিতেন, সেই সব স্থান প্রতিক্ষণে বৃশ্চিকরূপে ভুবনেশ্বরীকে দংশন করিতে লাগিল। ভুবনেশ্বরীর বড় কান্না আসে; কিন্তু তাহার চক্ষে জল দেখিলে তাহার শিশু পুত্র সুধীর খেলা-ধুলা ছাড়িয়া মায়ের মুখের পানে আকুলনেত্রে চাহিয়া থাকে; সেটা তো সহ্য করা যায় না। তখন ছেলেকে কোলে তুলিয়া চুমা খাইয়া তাহাকে, হয় খেলানা, না হয়, খাবার দিতে হয়। তাহার স্নেহময় দাদা গোপীনাথও কত রকম সান্ত্বনা ও সহানুভূতি করেন। কখনও তিনি বলেন, "আজ তুই চুল বাঁধিস্ নি কেন, ভানু?" কখনও বা তিনি বলেন, "তোর মুখখানি দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যাচ্ছে; নিজের খাওয়া-দাওয়ার দিকে তুই মোটেই যত্ন করিস্ না, এ তোর বড় দোষ। বউকে নিয়ে আস্‌তে বলিস্ তো এনে দিই। তা সে আবার বাড়ীঘর ছেড়েই বা কি করে আস্‌বে? তা লক্ষ্মী দিদিটী আমার! তুমি নিজের প্রতি একটু বিশেষ যত্ন কোরো।" গোপীনাথ মনে মনে জানিতেন, তাঁহার স্ত্রী মোহিনী বড় স্বার্থপরায়ণা, বড় মুখরা এবং বড়ই গর্ব্বিতা। তাহার জন্য গোপীনাথ এক-দিনের জন্যও একটু শান্তি পা'ন নাই। তাহাকে ভুবনেশ্বরীর নিকটে আনা কোনও মতে সঙ্গত নহে। যাহা হউক, সহোদরের সান্ত্বনা ও স্নেহে ভুবনেশ্বরী অনেক তৃপ্তি লাভ করিত। তবে রাত্রে যখন দাদা ঘুমাইতেন, খোকা ঘুমাইত, তখন প্রাণাধিক স্বামীর মধুমাখা স্মৃতি অগ্নিমাখা হইয়া ভুবনেশ্বরীর প্রাণ পর্য্যন্ত

দগ্ধ করিত। তখন ভুবনেশ্বরী যুক্তকরে ডাকিত, "হে ভগবন্, তাঁকে ভাল রাখ ; তিনি ভাল আছেন, সেই সংবাদ আমায় দাও।"

ভুবনেশ্বরীর এই রকম কাতরতার আরও একটী বিশেষ কারণ ছিল। তাহা বলিতেছি।

রমাকান্ত প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বদিনে দ্বিপ্রহরে নীচের তলায় বৈঠকখানায় বসিয়া "বেঙ্গলি"-কাগজ পড়িতেছিলেন ও সদর দরজা খুলিয়া রাখিয়া দ্বারবান্ রামদীন পাঁড়ে বেঞ্চির উপরে ঘুমাইতেছিল। রমাকান্ত সহসা মনুষ্যাগমন অনুভব করিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, পার্শ্বে একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।

রমাকান্ত দেখিলেন, আগন্তকের বয়স নবীন, আকৃতি সুন্দর, গলায় রুদ্রাক্ষ-মালা, হস্তে ত্রিশূল ও পরিধানে গৈরিক বস্ত্র। বিস্মিত ভাবে রমাকান্ত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি ?" আগন্তক বলিল, "নবীনানন্দ স্বামী।"

ভিক্ষুক বা অতিথি পাইলে রমাকান্ত তাড়াইয়া দিতেন না ; যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি নবীনানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চান্ আপ্নি ?"

নবীনানন্দ উত্তর করিলেন, "আপাততঃ কিছুই নয়।"

রমাকান্ত বলিলেন, "বসুন।"

নবীনানন্দ বসিলেন না ; রমাকান্তের মুখ-পানে চাহিয়া বলিলেন, "বাবুজী প্রবাসে যাইতেছেন ?"

রমাকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কোথায় শুনিলেন ?"

ধীরে ধীরে নবীনানন্দ বলিলেন, "কোথাও শুনি নাই। আপনার অদৃষ্টলিপি দেখিতেছি।"

এ রকম ভাগ্যগণনায় যদিও রমাকান্তের বড় বিশ্বাস ছিল না ; তথাপি তিনি বলিলেন, "আবার ফিরে আস্‌ব কবে, বলুন দেখি ?"

সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া নবীনানন্দ বলিলেন, "আপনার পত্নী পতিব্রতা সতী। তাঁহার একটী শিশুপুত্র আছে।"

রমাকান্ত চমৎকৃত হইলেন।

নবীনানন্দ পুনরপি বলিলেন, "ডাক্তার-বাবু! এ সুখের গৃহ ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া কি হইবে ?—আপনি যাইবেন না।"

রমাকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু তা কি হয় ? এতটা প্রস্তুত হইয়া একটা পথের লোকের কথায় নিরস্ত হওয়া—ছি! ছি! তা কি হয় ?

কিছু ক্ষণ দুইজনেই নীরব। তারপরে নবীনানন্দ কহিলেন, "বাবুজী! না গিয়া পারিবেন না। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের জন্য সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রমাকান্ত বলিলেন, "কেন ?"

ত্রিশূলধারী একটু বিলম্বে বলিলেন, "হয় তো শীঘ্র আসিতে পারিবেন না! অদৃষ্টলিপি পাঠ করা কাহার সাধ্য ?"

এবার বিদ্রূপের ভাবে রমাকান্ত বলিলেন, "আপনার সাধ্য আছে বৈ কি ?"

নবীনানন্দ হাসিয়া বলিলেন, "আমি অতি-ক্ষুদ্র ব্যক্তি। আমি গুরুদেবের দাসানুদাস।"

ত্রিশূলধারীর কথা যে রমাকান্ত সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পত্নী উদ্বিগ্ন

হইবে ভাবিয়া, তাহার কাছে তিনি সে-প্রসঙ্গ-মাত্র করিলেন না। তবে সেই দিন সন্ধ্যাকালে দুইজনে যখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন, তখন রমাকান্ত কথায় কথায় বলিলেন, "দেখ! মনুষ্য-জীবন তো নশ্বর। যদি আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন সহসা চলে যাই, তবে যে জীবিত থাক্‌বে, সুধীরকে প্রকৃত মানুষ করা তা'রই প্রধান কর্ত্তব্য হবে; এ আমাদের মনে রাখা আবশ্যক।"

শরীরের যেখানে বেদনা, সেই স্থানে আঘাত লাগিলে ব্যথী যেমন কাতর হইয়া পড়ে, স্বামীর কথা শুনিয়া ভুবনেশ্বরী তেমনি কাতর হইয়া পড়িল। সে বলিল, "তুমি অমন কথা বোলো না; শুন্‌তে আমার ভয় করে। আমি যেন জন্ম-এয়োতী হয়ে, সুধীরের সকল ভার তোমার ওপরে দিয়ে চলে যাই।" অবশ্য রমাকান্ত সহধর্ম্মিণীকে, হাসিয়া, আশ্বাস দিয়া আদর করিয়া সে ব্যথা ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি চলিয়া গেলে ভুবনেশ্বরীর মনে সেই কথা, সেই "পোড়া কথা" বারংবার জাগিত। তাহার স্বামীর জন্য এত অধিক কাতরতার প্রধান কারণ তাহাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমা—

প্রতীক্ষা।

জীবনে আমার যে-দিন কবে
আসিবে বিশ্বভূপ,
সবার মাঝারে যে-দিন আমি
দেখিব তোমার রূপ?
সংসার-মাঝে নির্ব্বোধ, তাই
বল গো অন্তরযামী,
কোন্ শুভদিনে তোমারে প্রভু
বুঝিতে পারিব আমি?

আছে মোর কান তবুও বধির;
কিছু না কখনো শুনি!
কবে গো শুনিব মঙ্গলময়,
তোমার অমৃতবাণী?
আমাদের মাঝে শুভাশীষ তব
কবে গো আসিবে নেমে,
শুষ্ক হৃদয় কবে গো আমার
ভরিয়া উঠিবে প্রেমে।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্ব।

অশ্বের যত্নের ভার সহিসের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত। কিন্তু তা বলিয়া যে গৃহকর্ত্রী এ-বিষয়ের প্রতি উদাসীন থাকিবেন, তাহা নহে। গৃহকর্ত্রী যেটা স্বয়ং না দেখিবেন, সেটা অসম্পন্ন রহিয়া যাইবে। প্রত্যেক অশ্বের জন্য একজন ঘাসওয়ালা এবং প্রত্যেক তিনটী অশ্বের জন্য একজন সহিস নিযুক্ত থাকা চাই। অশ্বের জন্য কৈফিয়ৎ সহিসকে দিতে হইবে। সহিস ঘাসওয়ালার বিরুদ্ধে যদি কিছু

বলে, তবে তাহার প্রতি ন না। সহিসকে সকল বিষয়ে দায়ী করিলে তাহাকে প্রত্যেক বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে হইবে বলিয়া, তাহার অনেকটা সময় যাইতে পারে; কিন্তু কখনও কখনও তাহাকে পুরস্কার দিলে সে আর ক্ষুণ্ণ হইবে না। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার সহিস আসিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট হইতে হুকুম লইয়া যাইবে। এরূপ করিলে সে ঘোড়াকে জুতিবার পূর্ব্বে তাহাকে উত্তমরূপে খাওয়াইবার অবসর পাইবে।

প্রত্যুষে ঘোড়ার দানার সিকি অংশ ঘোড়াকে খাওয়ান চাই। গ্রীষ্মকালে দানা খাওয়াইবার পূর্ব্বে ঘোড়াকে সামান্য জল খাওয়ান উচিত। শীতকালে এরূপ প্রথা অবলম্বন করার কোন প্রয়োজন নাই। দানা খাওয়ানর পর হাল্‌কা মালিশের আবশ্যক। ঘোড়ার গাত্রবস্ত্র উদ্ঘাটিত করিয়া একটী কোণে রক্ষা করিবে। অতঃপর অশ্বশালাকে পরিষ্কার করিবে। ইহার পর ঘাসওয়ালাকে ঘাস আহরণের জন্য পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু তাহাকে মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিবে।

অশ্বারোহণের পর অশ্বকে ধরিবার জন্য সহিস অশ্বশালার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং ঘোড়ার উপর একখানা বস্ত্র রাখিয়া তাহাকে পাদচারণা করাইবে। এতদ্দ্বারা অশ্বের শৈত্য লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ঘোড়া দলা হইলে তাহাকে জল খাওয়াইয়া অল্প পরিমাণে ঘাস খাইতে দিবে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘোটক চড়া হয় নাই, তাহাদিগকে ঘুরাইয়া লইয়া আসিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের পর তাহাদিগকে জলপান করাইবে। অতঃপর সকল ঘোড়াগুলিকে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য শস্য খাইতে দিবে। বেলা তিনটার সময় তাহাদিগকে পুনরায় জল খাওয়াইয়া ৪টার সময় তাহাদিগকে পুনরায় শস্য খাইতে দিবে। অনন্তর উত্তমরূপে দলার পর তাহাদিগকে সান্ধ্য ব্যায়ামের জন্য বাহির করিবে। তাহারা প্রত্যাগমন করিলে তাহাদিগকে রাত্রিকালের জন্য ভোজন করাইয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ঘোড়াকে আহার তিনবার দেওয়া উচিত। ইহার কম আহার দেওয়া উচিত নহে। ছোলা শুষ্ক দেওয়াই বিধি; অথবা তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিতে পার। ঘোড়াকে ছোলা খাওয়াইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাকে জল পান করাইবে; কিন্তু ছোলা খাওনর অব্যবহিত কাল পরে জল দিবে না।

একই আহার প্রতিদিন খাওয়ান উচিত নহে। তাহাতে স্বাস্থ্য বজায় থাকিতে পারে না। আহারের পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্য-রক্ষার একটি প্রধান উপায়। শস্য খাওয়াইতে হইলে তাহার সহিত যব, ছোলা বা ভৈজ-চূর্ণ দিতে পারা যায়।

ঘোড়াকে সপ্তাহে একবার চোকর-মণ্ড খাওয়ান উচিত। এক বা দুই সের গাজর, কাঁচা গম, লুসার্ণ, ঘাস অথবা ইক্ষু যদি প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, তবে ঘোড়ার স্বাস্থ্য অতিশয় উত্তম থাকে। ঘোড়ার কোনরূপ অসুখ হইলে সহিস যেন গৃহকর্ত্রীর নিকট গোপন না করে। যদি সময়ে সময়ে সহিসকে বক্সিস দেওয়া হয়, তবে সে কিছুমাত্র গোপন করিবে না।

শীত-সমাগমে অশ্বশালায় নিযুক্ত ভৃত্য-গণকে একখানা করিয়া কম্বল দিবে; নতুবা তাহারা ঘোড়ার কম্বল চুরি করিবে। অর্থের অস্বচ্ছলতা থাকিলে কম্বল তাহাদিগকে একেবারে দান করিবে না; বরং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবে যে, চাকুরি পরিত্যাগ করিলেই কম্বল ফেরৎ দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে কম্বলকে ধৌত করাইয়া গৃহে রাখিয়া দিবে।

ঘোড়া যদি উত্তমরূপে দলা হয় তবে তাহারা অত্যন্ত আব্‌হাওয়ার অনুভাবক হয়। সুতরাং, ঘোড়ার কাপড় দিতে কখনও ক্ষুণ্ণ হইও না। যদি ঘোড়াকে সুস্থ রাখিতে হয়, তবে এরূপ করিতেই হইবে।

অশ্বশালার মেজে কাঁচা মৃত্তিকার হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সমতল হওয়া চাই। বন্ধুর মেজে ঘোড়ার কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। মেজেকে সপ্তাহে একবার গোবর, জল ও বালুকা দ্বারা লিপ্ত করা বিধেয়। খড় ঘোড়ার পক্ষে উত্তম বিছানা। যেখানে ঘাস অধিক সেখানে লোকেরা দূর্ব্বা ব্যবহার করিয়া থাকে। অশ্বশালায় ঘোড়াকে জলপান করাইবার জন্য একটা নাদ থাকা উচিত। জল টাট্‌কা হওয়া চাই। বেশী জল পরিত্যজ্য।

এক্ষণে অশ্বরথীদিগকে কি কি করিতে হইবে তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(১) ঘোড়াকে আহার করাইবার পূর্ব্বে জলপান করিতে দিবে; পরে নহে।

(২) শস্য কখনও আর্দ্র দিবে না।

(৩) সামান্য রোগ হইলে বা আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ত্রীকে জানাইবে।

(৪) ঘাসকে উত্তমরূপে পিটিয়া খাওয়াইবার একদিন পূর্ব্বে শুষ্ক করিতে দিবে।

(৫) ঘোড়া দলিতে হইলে দুইজনে দলাই বিধি।

(৬) ঘোড়ার পা কখনও ধৌত করিবে না। যদি কচিৎ ধৌত করা হয় তবে উত্তম-রূপে শুষ্ক করিতে হইবে।

সহিস যে কেবলমাত্র ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা নহে; তাহাকে ঘোড়ার সাজের প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জিন্‌কে সাবান-দ্বারা সপ্তাহে এক-বার ধৌত করিলেই যথেষ্ট। ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিবার জন্য রেকাব প্রভৃতি লৌহ-পদার্থ শুষ্ক বালুকা দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে। যদি জলে ধৌত করা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শুষ্ক করিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে জীনের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া তাহাকে নষ্ট করে; সুতরাং, জীন্ রাখিবার স্থানের উপর কর্পূরের পুটুলি বা নিমপাতা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

বড় ও ছোট।

মোটর সম্ভাষি' কহে গরুর গাড়ীরে
"ধিক্ তোরে, মন্দবেগ ধরিস্ রে অতি।"

বিনয়ে গরুর গাড়ী উত্তরিল তারে
"বিকল হইলে তুমি আমি তব গতি।"

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

তপস্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৭)

বাংলা-দেশে মেয়ে দশ বৎসরে পড়িলেই তাহার বিবাহ দিতে হয়। নচেৎ সমাজ বড় চটেন! আত্মীয়-বন্ধুগণ কন্যার মাতাপিতাকে ঘৃণা করেন। প্রতিবেশিবর্গের হাসি-টিট্‌কারির জ্বালায় কন্যার মাতাপিতাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। যদি কাহারও কন্যা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে এমন বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে থাকে যে, তাঁহার নিরুদ্বেগে দিনযাপন করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এ-দিকে প্রচুর অর্থের সংস্থান করিতে না পারিলেও কন্যার সৎপাত্রে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। কন্যাটী যতই সুন্দরী বা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া হউক্ না কেন,—মনোমত দক্ষিণা না পাইলে কোনও ভদ্রনামধারী ব্যক্তি সে-কন্যা গ্রহণ করেন না। কাজেই বাংলাদেশে কন্যার বিবাহ দেওয়া একটা বিষম সর্ব্বনাশের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যই কন্যার বিবাহে বাঙ্গালীর গৃহে আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দই অধিক দৃষ্ট হয়। তাই বাঙ্গালীর কন্যার জন্মমাত্র কি এক অশুভ আশঙ্কায় মাতাপিতার প্রাণ কাতর হয়। যেন একটা দারুণ অভিশাপ লইয়া বাঙ্গালায় রমণী জন্মগ্রহণ করে। আমাদের বালিকা বিভাও হতভাগিনী বঙ্গবালা। তাই দশম বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার পিতা এবং মাতা বিভার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

বিভার পিতা সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি নহেন। মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কোনও 'মার্চ্চেণ্ট'-আফিসে তিনি কেরাণীগিরি করেন; অনেকগুলি পুত্র-কন্যার ভরণপোষণ তাঁহাকে করিতে হয়। আয় সামান্য বলিয়া বাসের বাড়ীখানির অর্দ্ধাংশ ভাড়া দিতে হইয়াছে; অপরার্দ্ধাংশে কায়ক্লেশে তাঁহারা বাস করেন। তাহাকে আরও দুইটী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, রীত্যানুযায়ী দক্ষিণাদানে অশক্ত হওয়ায় কন্যাগুলি মনোমত পাত্রে অর্পিত হয় নাই। দুইটীকেই যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষের পাত্রের দর বড় চড়া; দরিদ্রের সে বাজারে প্রবেশ করিবার সাধ্য বা অধিকার নাই। বিভার জন্যও তিনি তাঁহার অবস্থার অনুযায়ী পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের আদৌ ইচ্ছা নহে যে, এমন প্রস্ফুটিত-গোলাপতুল্য সরলা বালিকা-ভগ্নীটিকে একটী বৃদ্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়। কিন্তু মনের বাসনা থাকিলে কি, হইবে? তাহার ত অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই! অর্থ ব্যতীত মনের মত পাত্র সে কোথায় পাইবে? সে চায় সর্ব্বগুণান্বিত একটী যুবকের হস্তে তাহার এই আদরিণী কনিষ্ঠা ভগ্নীটিকে প্রদান করে। অমৃতে অরুচি কাহার? কিন্তু অমৃত কিনিতে হইলে অর্থের আবশ্যকতা। অতুলের সে অর্থ কোথায়? অনেক ভাবিয়া

চিন্তিয়া একদিন সে সুধীরের কাছে বিভার বিবাহের কথা উত্থাপন করিল এবং সুধীর যাহাতে বিভাকে বিবাহ করে, সে অনুরোধও করিল।

সুধীর তাহাকে বলিল, "ভাই, তা'তে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু বাবার অমতে ত বিয়ে করতে পার্ব্বো না।"

অতুল সাগ্রহে বলিল, "এই ত কথা!—যদি তাঁর মত হয়, তা'হ'লে তুমি ত বিনা দক্ষিণায় আমার বোন্‌টীকে বিয়ে কর্ব্বে?"

সুধীর বলিল, "নিশ্চয়।—আমরা দরিদ্র হ'লেও অর্থলোলুপ নই!"

সুধীরের কথায় তাহার বিশ্বাস হইল। কারণ, সুধীরের সহিত সে কমলাপুর গিয়া হরনাথবাবুকে দেখিয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি যে অর্থ-পিশাচ হইতে পারে না, ইহা অতুল বুঝিল। ও সে তাহার পিতাকে লুকাইয়া হরনাথবা এক পত্র লিখিল।

যথাসময়ে সে-পত্রের উত্তর আসিল। হরনাথবাবু আহ্লাদের সহিত জানাইয়াছেন যে, তিনিও সুধীরের বিবাহ দিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন। মেয়েটি যদি ভাল হয়, তা'হ'লে তাঁর এ-বিবাহে কোনও আপত্তি নাই। পত্র পাঠ করিয়া অতুলের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার আদরের ছোট বোন্‌টিকে যে একটা অপদার্থের হাতে পড়িয়া সারা জীবন অশান্তি ভোগ করিতে হইবে না; এবং তৎপরিবর্ত্তে প্রিয়সুহৃদ্ সুধীর যে তা'র স্বামী হইবে; ইহা অপেক্ষা অতুলের আর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে? হায়! সংসারানভিজ্ঞ যুবক! এ-সংসারের কূট অভিসন্ধি তুমি এখনও কিছুই জান না!

পত্র-হস্তে অতুল একমুখ হাসি লইয়া মাতার নিকটে গিয়া বলিল, "মা, বিভার বিয়ের জন্যে আর তোমাদের ভাব্‌তে হবে না। আমি তা'র খুব ভাল পাত্র ঠিক্ করিছি।"

মাতা সাগ্রহে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রে,—কোথায়?"

অ। এইখানেই।

মা। কি দিতে থুতে হবে?

অ। দিতে থুতে কিছু হ'বে না।—তবে আমরা মেয়ের গা সাজিয়ে এক এক খানা গহনা দেবো। তা'রা যেন ভদ্রলোক কিছু নেবেন না; তা'বলে আমাদের একেবারে কিছু না দেওয়া কি ভাল হয়? কি বল মা? কিন্তু এমন পাত্র লোকে টাকা দিয়েও পায় না।

মাতা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাদের পোড়া বরাতে কি আর এমন সুবিধে জুটবে বাবা!"

অতুল হাসিয়া বলিল, "জুট্‌বে কি? জুটেচে! এখন বাবাকে ব'লে শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিয়েটা দিয়ে ফেল! কি জানি নইলে হয় ত ফস্কে যেতে পারে।"

মা। পাত্রটী কে শুনি?

অ। আমাদের সুধীর গো—সুধীর।

মাতা, "ও—মা তাই বল!" বলিয়া নীরব হইলে, অতুল বলিল, "কি মা, চুপ ক'রে রইলে যে?"

মাতা মুখে একটি দুঃখ-সূচক শব্দ করিয়া বলিলেন,—"আ আমার কপাল, সে কি হ'বার যো' আছে বাবা!"

অতুল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা, হ'বার যো নেই কেন? আমি সুধীরের বাপ্‌কে চিঠী দিয়েছিলুম। এই দেখ, তিনি আমাকে লিখেছেন, মেয়ে পছন্দ হ'লেই তিনি বিয়ে দেবেন। টাকা তিনি চান্ না। বিভাকে দেখে কা'র পছন্দ না হবে? তবে আর হবে না কেন, মা?"

মাতা বলিলেন, "তার জন্যে নয়! ওরা যে বঙ্গজ কায়েৎ। ওদের সঙ্গে কি আমাদের চলিত আছে? তা থাক্‌লে আর ভাবনা ছিল কি?"

অতুল শুনিয়া মনে করিল ও-কথাটা কাজের কথাই নয়! তাই সে বলিল, "হ'লেই বা বঙ্গজ; তা'তে দোষ কি? আমি জানি ওদের বংশ ভাল। আর অমন ছেলে তুমি পাঁচ হাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবে না। ও-সব বঙ্গজ ফঙ্গজ রেখে দাও। সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দাও দে, মেয়েটা সুখে থাক্‌বে! তা না হয় ত, তোমার আর দু'মেয়ের মতন বুড়ো মাতালের হাতে প'ড়ে মর্‌বে দুঃখে।"

মাতা-পুত্রে যখন এই সকল কথা-বার্ত্তা হইতেছিল, তখন অতুলের পিতা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা-পুত্রের কথার কিয়দংশ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই অতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে অতুল?"

অতুল পিতার কাছে সমস্ত বিষয় বলিল এবং সুধীরের সহিত বিভার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া বলিল, "বাবা, সুধীরের সঙ্গে বিভার বিয়ে দিন্; বিভা সুখে থাক্‌বে।"

অতুলের পিতা সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন; শুনিয়া ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন। পরে তিনি বলিলেন, "তা কেমন করে হ'তে পারে?—আমরা হলুম্ দক্ষিণ-রাঢ়ী, ওরা হ'ল বঙ্গজ; ওরা ত আমাদের চল্‌তি ঘর নয়।"

অতু। চল্‌তি আর অ চল্‌তি কি! বাবা! চলালেই চলে যায়। ওরাও কায়স্থ ত বটে! আর বংশও সৎ। তবে আর এতে দোষ কি?

দোষটা যে কি তাহা অতুলের পিতা জানেন না। শুধু অতুলের পিতা কেন? কেহই তাহা জানেন না। তথাপি একটা ব্যর্থ দলাদলি লইয়া সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। বড় দুঃখের বিষয়, ইহা দেখিয়াও কেহ দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না।

অতুলের পিতা বলিলেন, "তা কি হয়? যা কখন হয় নি, তা কেমন করে কর্ব্বো?"

অতুল বলিল, "বাবা, এইটেই আমাদের মহা ভুল। আর এই দলাদলিতেই আমাদের মেয়ের বিয়ে দিতে এত বেগ পেতে হয়। ভারতে আমাদের স্বজাতির সকলশ্রেণীর মধ্যে যদি বিয়ের চল্‌তি থাক্‌ত, তা'হলে আর বরপণের এত পীড়াপীড়ি হ'ত না। এতে ত কোন দোষ নেই বাবা! সুধীরের সদ্বংশে জন্ম। সুধীরের বাপ্ অতিসজ্জন। এমন ছেলে আপনি পাঁচহাজার টাকা খরচ কর্‌লেও পাবেন না।—আর অমত কর্‌বেন না; দিয়ে দিন্। মেয়েটা সুখে থাক্‌বে। লোকের নিন্দার ভয়ে, মেয়েটার এমন ভাল বিয়ের সুযোগ ছাড়্‌বেন না।"

অতুলের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অতুল এতক্ষণ মনে মনে ভগ্নীর কত

সুখের কল্পনা করিতেছিল! এমন কি তাহাকে কি কি গহনা দিতে হইবে, মনে মনে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন পিতার কথা শুনিয়া তাহার সকল আশা নিষ্ফল হইল। অতুল দুঃখিত হইয়া বলিল, "বাবা, আমি যে সুধীরের বাপকে চিঠী লিখেছিলুম! এই দেখুন, তিনি উত্তর দিয়েছেন। হয়ত, তিনি মেয়ে দেখ্‌তেও আস্‌বেন। কি বল্‌বো ভদ্রলোককে? আপ্‌নারা বাবা, অমত কোর্‌বেন না; দিয়ে দিন! লোকে নিন্দা কল্লেই বা। যে নিন্দা কর্ব্বে, সে ত আমাদের টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়েতে সাহায্য কর্ব্বে না! তবে কেন আমরা আমাদের নিজের ভাল পরিত্যাগ কোর্ব্বো?"

অতুলের কথা শুনিয়া অতুলের পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; বলিলেন, "এখনকার ছেলেদের সব বাড়াবাড়ি! কা'কেও গ্রাহ্য নেই! আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে চিঠী লিখ্‌তে গেছ্‌লে কেন? বঙ্গজের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি সমাজ-ঠেকো হয়ে থাক্‌বো না-কি?"

হায় রে, জাত্যাভিমানী অধম বাঙ্গালি! আমাদের মনের এই সঙ্কীর্ণতাই আমাদের এই অধঃপতনের কারণ! স্বদেশীয় স্বজাতিগণের প্রতি পরস্পর আমাদের এত বিদ্বেষ! আমরা আবার দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি বলিয়া চিৎকার করিতে থাকি! আমাদের এই আত্মীয়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একতা স্থাপন করিতে না পারিলে, সহস্র বৎসর ধরিয়া "সমাজ" "সমাজ" বলিয়া উচ্চ ক্রন্দন করিলেও আমাদের কিছুই হইবে না। দরিদ্রদ্রোহী বরপণের এই তীব্র বিষ সকল সম্প্রদায় মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু কায়স্থ-সম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। দিন দিন এ কুপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে! কত গৃহস্থের ইহাতে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! বঙ্গজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই যদি বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের গৃহে গৃহে এত হাহাকার উঠিত না; সরলা বালিকা অজ্ঞানতা-বশতঃ অকালে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করিয়া মাতাপিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইত না। গৃহে গৃহে কন্যাদায়, গৃহে গৃহে হাহাকার! হতভাগ্য জাতির তথাপি চক্ষুরুন্মীলন হইল না!

অতুলের সহস্র অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও অতুলের পিতা সুধীরের সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। অতুল আর কি করিতে পারে? পিতার বর্ত্তমানতায় কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাহার অধিকার নাই। পিতা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। সুতরাং, তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল না। বিভার বিবাহ হইয়া যাইল। নগদ পাঁচশত টাকা দিয়া বিভার পিতা, বিভার জন্য একটী পাত্র ক্রয় করিলেন। পাত্রটীর বয়ঃক্রম ৪৫বৎসর মাত্র; তৃতীয় পক্ষের পাত্র।

সমাজের এই যথেচ্ছ অত্যাচার অতুল নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিল। সুধীরও সে বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; কিন্তু বিভার এ বিবাহ দেখিয়া সে সুখী হইতে পারিল না। বালিকার সুন্দরী মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া

গিয়াছিল। কিন্তু শুধু যে এইজন্যই সে সুখী হইতে পারিল না, তাহা নহে। দশ বৎসরের পাত্রী আর ৪৫ বৎসরের পাত্র! এরূপ মিলন তাহার চক্ষে কেমন বিষময় দৃশ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যদিও বিভার সহিত তাহার অল্পদিনের পরিচয়, তথাপি সে বিভাকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। তাই তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। নিজের হৃদয়-পানে চাহিয়া সে দেখিল, সেখানে একখানা গাঢ় কাল অন্ধকারময় মেঘ হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে! কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। হায় রে, নিষ্ঠুর সমাজ! তোমার এ কি অত্যাচার!

(৮)

সুধীর যখন বি, এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, ও ল' পড়িতেছিল ও মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি পাইতেছিল, তখন সুধীরের উপর এক ব্যক্তির লোলুপদৃষ্টি পতিত হইল। ইনি আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ। অবিনাশবাবু একজন মহামান্য ব্যবসায়ী লোক। জাপান হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের বিষয় শিক্ষা করিয়া তিনি ভারতে কারবার খুলিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইত। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। কিন্তু এ-সব গুণ থাকিলে কি হয়!—তাঁহার একটী বড় দোষ ছিল; তিনি অত্যন্ত অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ছিলেন। তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন; পরের মতানুযায়ী চলা বা কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করা তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তিনি সুধীরের সহিত তাঁহার কন্যা লীলার বিবাহ দিবেন, মনস্থ করিলেন। "বাঙ্গাল" বলিয়া গৃহিণী একবার নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও, সে আপত্তি টিকিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবিনাশবাবু একজন তেজস্বী ব্যক্তি; কাহারও কথা তিনি গ্রাহ্য করেন না; গৃহিণীরও না! তাই তিনি গৃহিণীর এ আপত্তি শুনিলেন না। তিনি অবজ্ঞা ভরে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, রেখে দাও তোমার বাঙ্গাল্! এমন ছেলে কটা আছে, বল দেখি? দশহাজার টাকা দিলেও এমন ছেলে এখানে মিল্‌বে না! বিদ্বান্ যে রকম; আবার চেহারাখানিও তেমনি সুন্দর! কোথায় এমন পাত্র পাও? লীলার বিয়ের জন্যে আজ এক বৎসর ধরে ছেলে খুঁজ্‌ছি,—কোথাও মনের মত বর দেখ্‌তে পেলুম না। এ ছেলে হাতছাড়া কর্‌তে পার্‌বো না। আমি না মেয়ে দিই,—কত লোকে এমন ছেলের সঙ্গে মেয়ে দেবার জন্যে ঝুঁকে পড়্‌বে।" গৃহিণীর আর সাধ্য হইল না কর্ত্তার কথার উপর কথা কহেন।

অবিনাশবাবু ঘটকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া হরনাথবাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে আনাইয়া কন্যার বিবাহের সমস্ত কথা পাকাপাকি করিয়া ফেলিলেন। হরনাথ-বাবু আনন্দের সহিত পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, এতদিনে ভগবান্, বুঝি, সুধীরের একটা ভাল মুরুব্বি জুটাইয়া দিলেন। হায়! অন্ধ মানব এমনই আশার দাস!

লীলার সুগোল, সুডোল গঠনখানি, কুঞ্চিত-কৃষ্ণ কেশরাশি, আয়ত চক্ষুদ্বয়, স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সকলই হরনাথবাবুর চক্ষে অতুলনীয় সুন্দর বলিয়া মনে হইল।

তাহার সর্ব্বাঙ্গে তিনি যেন একটা মাধুর্য্য মাখান দেখিলেন। বুঝি, এমনটী আর নাই।

সুধীর নিজের বিবাহের কথা শুনিয়া একটু আপত্তি করিয়াছিল। সে স্পষ্টই পিতাকে বলিয়াছিল, "বাবা, আমরা গরিব; বড়লোকের মেয়ে আমাদের ঘরে সাজ্‌বে না। এ বিয়েতে কাজ নেই।" কিন্তু হরনাথ-বাবু "না" বলিতে পারিলেন না। একে ত, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর লীলার সেই স্নেহমাখা কোমল মুখখানি বৃদ্ধের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লীলাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুত্রবধূ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত বাসনা জন্মিতেছিল।

বিধাতার ভবিতব্যতাই বলুন, আর লীলার কর্ম্মফলই বলুন, শ্রীমান্ সুধীরের সহিত লীলার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কলিকাতাতেই উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

বিবাহের পরে হরনাথবাবু পুত্র ও পুত্রবধূ স্বগৃহে লইয়া যাইতে চাহিলেন। অবিনাশবাবু কিন্তু নানা ওজর আপত্তি উত্থাপন করিয়া বৈবাহিককে নিরস্ত করিলেন। তিনি বলি-লেন, "লীলা এখন নেহাৎ ছেলে মানুষ। আপনার ঘরে কেউ নেই; সে কা'র কাছে থাক্‌বে? একটু বড় হোক্, নিয়ে যাবেন। সে ত এখন আপনারই হ'ল; যখন ইচ্ছা নিয়ে যাবেন, তার জন্যে আর কি? এখন যদি সেখানে গিয়ে ওর মন না টেকে—কাঁদাকাটা করে—তা হ'লে একটা অসুখ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর আপনিও তা'হলে বিপদে পড়্‌বেন।"

হরনাথবাবু অধিক পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না; ক্ষুণ্ণমনে একাকী গৃহে প্রত্যা-গমন করিলেন। গ্রামের লোকে বধূ দেখি-বার জন্য তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলে, তিনি তাহাদের অনেক বলিয়া কহিয়া শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের মন তৃপ্ত হইল না। তাঁহার এত আদরের সুধীরের বৌ, তাঁহার একমাত্র পুত্রবধূ, সে বধূ তাঁহার গৃহে আসিল না; এ কি প্রকার বিবাহ হইল! মুখেত অবিনাশবাবু খুব সৌজন্য দেখাইলেন; ভিতরে কি তাঁহার কিছুই নাই? সকলই কি মুখ-সর্ব্বস্ব? কেবল খোসা-ভূষি সার! সুধীর ত বলিয়াছিল, "বড়লোকের মেয়ে গরিবের ঘরে সাজ্‌বে না।" সত্যই কি শেষে সুধীরের কথা কার্য্যে পরিণত হইবে? কেনই বা তবে তিনি সুধীরের কথা না শুনিয়া বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন? কিন্তু এখন আর সে চিন্তা করা বৃথা! কার্য্যশেষে অনু-শোচনায় কোনও লাভ নাই।

(২)

দেখিতে দেখিতে আরও তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। ইহার মধ্যে হরনাথবাবু আরও দুইবার লীলাকে আনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু এ দুইবারও নানা ওজর আপত্তি উত্থা-পন করিয়া অবিনাশবাবু লীলাকে পাঠান নাই।

এদিকে সুধীর যখন এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া একটা মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার ফলে কত নিরীহ যুবককেও শ্রীঘরবাস করিতে হইয়াছিল! দোষীর সহিত কত নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল!

সুধীর একে মেসে থাকিয়া এম-এ পড়িতেছিল, তাহাতে সে পূর্ব্ববঙ্গবাসী। সুতরাং, সে যে একজন 'এনার্কিষ্ট'-দলভুক্ত—ইহা পুলিশ-পুঙ্গবের দৃঢ় বিশ্বাস হইল। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টিতে পতিত হইয়া সুধীর কারারুদ্ধ হইল। তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য অবিনাশবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ সুধীরকে অপরাধী প্রমাণ করিতে সমর্থ হইল না। কিছুদিন কারাবাসের পর সহৃদয় বিচারপতি সুধীরকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ জানিয়া মুক্তিপ্রদান করিলেন। রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় সুধীর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। সেবার পরীক্ষায় সে এম-এতে নিম্ন স্থান অধিকার করিল, ও আইনে 'ফেল' হইল। তাহার পর মনের কষ্টে সে পিতার নিকট দেশে চলিয়া গেল।

মানুষের সময় যখন মন্দ হয়, তখন সকল দিক্ হইতেই অশান্তি আসিয়া দেখা দেয়। সুধীর গৃহে আসিয়া দেখিল, পিতা পীড়িত। সেই জীর্ণশীর্ণ, রোগক্লিষ্ট, ক্ষীণ দেহে তাঁহাকে গৃহের অনেক কার্য্যই স্বহস্তে করিতে হইতেছে। তাহা দেখিয়া সুধীরের বড় কষ্ট হইল। তাহার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। সে বিবাহ করিয়াছে কি জন্য? স্ত্রীটী দেবতার মত অদৃশ্য থাকিবে, আর সে সেই স্ত্রীর ধ্যানে জীবনাতিপাত করিবে বলিয়া? না, বৃদ্ধ পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়া? সে ত পিতার সেবাশুশ্রূষা করিবে বলিয়াই অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিল। স্ত্রী যদি তাহা না করিল, তবে সেরূপ স্ত্রীতে তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। হউক্ না, সে ধনাঢ্যের কন্যা। দরিদ্রের পুত্রবধূ—দরিদ্রের স্ত্রী ত সে বটে? কেন সে তবে তাহার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবে না? সুধীর মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, আমি তাই শিখেছি। ঘরের কাজ কর্‌তে কখনো শেখান নি, আমিও তা শিখি নি যে, আপনার একবিন্দু সাহায্য করি। কিন্তু আপনি যে এ বয়েসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে আমাকে খাওয়াবেন, তা আর আমি সহ্য কর্‌তে পার্ব্বো না। আর এখন্ আমার চাক্‌রিও কিছু হয় নি যে, একজন রাঁধুনি রাখ্‌তে পারি। আপনি এক কাজ করুন,—একবার কলিকাতায় গিয়ে ওদের নিয়ে আসুন।"

হরনাথবাবুরও কি সেই ইচ্ছা নহে যে, পুত্রবধূটী আসিয়া তাঁহার এ নির্জ্জন গৃহখানি জনপূর্ণ করিয়া তোলে? তাঁহার কি ইচ্ছা হয় না যে, তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবধূ একমুষ্টি ভাত রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়ায়? কিন্তু কি করিবেন! সে সুখ তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি না বুঝিয়া এক কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। বিধিলিপি অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হরনাথবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "না, বাবা, সেখানে বউমাকে পাঠাবেন না। মিছে আন্‌তে যাই। সে আসবে না। সে বড়লোকের মেয়ে।" সুধীর মনে মনে বলিল, সে কথা আমি আগেই বলেছিলাম—তখন শুন্‌লেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা বলিয়া পিতার মনে কষ্ট দেওয়া সে যুক্তিসঙ্গত মনে করিল না। তাই সে বলিল, "কেন আসবে না? হোক্ সে বড় লোকের মেয়ে। গরিবের বউ ত হয়েছে?

আর এখন যে নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নেই যে কাঁদাকাটায় ওজর দেখাবে। আপনি একবার যান্ দেখেই আসুন না কেন, কি বলেন। এবার যদি না পাঠান, তা হলে যা'হোক্ একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়্ব না। চিরকাল বাপের অট্টালিকায় বসে সুখভোগ কর্ব্বে, এমন কোনো লেখাপড়া করে ত আপ্নি আমার বিয়ে দেন নি!"

হরনাথবাবু বুঝিলেন, সুধীরের একান্ত ইচ্ছা বধূটীকে লইয়া আসা। তাই তিনি আর কোনও দ্বিরুক্তি না করিয়া একটু সুস্থ হইয়া বধূ আনিতে কলিকাতায় গেলেন। অবি-নাশবাবু কিন্তু কন্যা পাঠাইতে এবারেও অসম্মতি জানাইলেন। অধিকন্তু বৈবাহিককে বেশ "মিঠে-কড়া" রকম দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। হরনাথবাবু আর কোনও কথা না বলিয়া নীরবে প্রস্থান করিলেন।

সুধীর একে পূর্ব্ব হইতেই পত্নী ও শ্বশুরের উপর চটিয়াছিল; এবার তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সে মনে মনে একটা দৃঢ়সংকল্প করিয়া স্ত্রীকে আনিতে স্বয়ং যাত্রা করিল। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

আকাঙ্ক্ষা।

সকলি দিয়াছ প্রভু,
আর কিছু নাহি বাকি;
তবুও ভিখারী হয়ে
ও-চরণে আশা রাখি!
সঙ্কল্প বিকল্প শত
পলে পলে রহে জাগি;
পথহারা হয় ভ্রমে;—
চিত্ত দীন কা'র লাগি!
আশার আলোক ফুটে;
নিরাশা নিভায় বাতি।
চেয়ে থাকি কা'র পানে!—
কবে পোহাইবে রাতি!
আসক্তি কঠিন পাশ,
ছিঁড়িবে কাহার বলে?
মান অভিমান সব,
ভেসে যাবে কোন্ জলে?
সুখে দুখে নির্ব্বিকার
কর এই চিত্তভূমী,
বাঞ্ছিতের এ আকাঙ্ক্ষা
পূরাও জগৎ-স্বামী!

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।—শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের পঞ্জাবশাখার সেক্রেটারী। তিনি পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা হইতে প্রতিনিধিও ভারত-সচিবের নিকট নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানাইতে চাহেন:—(১) পঞ্জাবের নারীদের বিশেষ প্রয়োজন।

(২) পঞ্জাবে যে-সকল নারী বর্ত্তমান সময়ে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা।

(৩) বিধবার সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে বলিয়া অভাবগ্রস্ত বিধবাদের জন্য আশ্রম-স্থাপন এবং প্রত্যেক বিধবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা।

(৪) হিন্দুবিধবাদের স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ বিধির প্রণয়ন।

(৫) ভারতের বিবাহিতা নারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হউক যে, বিবাহিত ভারতীয় পুরুষ কোন ইংরাজনারীকে বিবাহ করিলে, তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

(৬) ভারত-নারী আইন বা অন্য যে কোনও ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৭) মিউনিসিপাল বা অনুরূপ সকল নির্ব্বাচনে ভারতনারী অধিকার পাইবেন।

(৮) স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে যত অনুষ্ঠান আন্দোলন আছে, ঐ সকলের মধ্যে ভারত-নারীদিগকে গ্রহণ করা হউক্।

(৯) ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা গঠিত কমিটিকে বালিকাবিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হউক্।

(১০) বিদেশের মহিলাদের স্থলে ভারতীয় মহিলাদের দ্বারা পরিদর্শন-এজেন্সী গঠিত হউক।

(১১) স্ত্রীশিক্ষার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে উপদেশ দিবার জন্য মহিলা 'এড্ভাইসরী বোর্ড' গঠিত হউক।

(১২) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের মত ঐ মহিলাবোর্ডকে পদগৌরব অর্পণের ব্যবস্থা করা হউক।

২। মহিলা প্রতিনিধি—ভারতের মহিলা প্রতিনিধিগণের ১৮ই ডিসেম্বর মান্দ্রাজ নগরে ভারত-সচিবের সহিত দেখা করিবার কথা। এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী শ্যামলা নেহরু, শ্রীমতী মোহানি ও মিঃ মহম্মদ আলির জননী প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। বাধ্যতামূলক বালিকা-শিক্ষা।—মহীশূর গবর্ণমেণ্ট মহীশূরে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার কল্পে বহু সুব্যবস্থা করিয়াছেন। সংপ্রতি এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, মহীশূর ও বাঙ্গালোর এই দুই নগরের ৭ হইতে ১০ বৎসরের বালিকাদের উপরে ১৯১৮ সালের ১লা জুলাই হইতে বাধ্যতামূলক নিম্নশিক্ষা আইন বলবৎ হইবে।

৪। ইংরেজ মহিলাদের বাঙ্গালা ও উর্দ্দু পরীক্ষা।—গেজেটেড্ অফিসারদের স্ত্রী ও নিকট আত্মীয়দিগকে দেশী ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত বাঙ্গলা ও উর্দ্দুর পরীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থিনীদের ১০ টাকা ফি দিতে হইবে। উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাদের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হইবে ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে; কিন্তু তাঁহারা অন্য কোনও পুরস্কার পাইবেন না।

৫। ব্রিটিশ নারীদের কর্ম্ম-শক্তি।—ব্রিটনে এখন ৪৭½ লক্ষ নারী যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইহাদের মধ্যে ১২॥ লক্ষের অধিক সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ৬ লক্ষ ৭০ হাজার নারী গোলাগুলি নির্ম্মাণ করেন। যুদ্ধারম্ভের পরে কার্য্যক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে।

৬। নৌ-সৈন্য-বিভাগে নারী।—ইংলণ্ডের

নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের উপকূলবিভাগে নৌ বিভাগীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা নারীর দ্বারা একটি দল গঠন করিয়াছেন।

৭। বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন পদ।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংপ্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি নূতন পদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার কার্য্য, পরীক্ষাসমূহের তত্ত্বাবধান। গত মেট্রিকুলেশন, আই-এ ও বি,এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি হওয়াতে এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

রেজেষ্টারী বিভাগের ইনস্পেক্টার জেনারেলের পার্সোনেল এসিষ্টাণ্ট শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৮। সৎকার্য্যে দান।—বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন হোমের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, শ্রীমতী হরিমতি দাসী তাঁহার স্বামী কলিকাতা-নিবাসী বাবু পূর্ণচন্দ্র দত্তের স্মৃতিতে একটি স্মৃতিগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০০৲ টাকা এবং ঐ গৃহে একটি রোগী রাখিবার আংশিক ব্যায় বাবদে ১৭০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

সংক্ষিপ্ত পুস্তক-সমালোচনা।

ওঁ পিতা নোঽসি—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বিরচিত। কলিকাতা ৬।১ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, (পূর্ব্বদ্বার) হইতে শ্রীহরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ইহা হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ১১শ-স্থানীয়। ইহার মূল্য ॥০ মাত্র।

গ্রন্থখানি বৈদিকযুগের "ওঁ পিতা নোঽসি" —(তুমি আমাদিগের পিতা)—এই মন্ত্র অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। আদিকাল হইতে স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টিপ্রপঞ্চের স্বাভাবিক অনভিব্যক্ত পিতৃভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, আমাদিগের প্রাচীন ঋষিগণ যে-ভাবকে সর্ব্বাগ্রে "পিতা নোঽসি"—তুমি আমাদিগের পিতা—এইবাক্যে ব্যক্তরূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে সেই পিতৃভাবে আহ্বান করিবার তাৎপর্য্য ও সার্থকতা গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে অতিসুন্দররূপে প্রাণময়ী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঈশ্বর স্রষ্টা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জগৎপাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর জ্ঞানদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা, আমরা অজ্ঞানতা-বশতঃ তাঁহার মঙ্গলময় প্রলয়ে তাঁহাকে রুদ্র-রূপে দর্শন করিলেও, ঈশ্বর প্রলয়কর্ত্তা বলিয়াও আমাদিগের পিতা, ঈশ্বর ধর্ম্মাবহ বলিয়া আমাদিগের পিতা এবং ঈশ্বর শুভদাতা বলিয়া আমাদিগের পিতা। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের পালনী ব্যবস্থা, ঈশ্বরের শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রভৃতিও গ্রন্থে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে ভগবানের সৃষ্টি-, স্থিতি- ও প্রলয় বিধানে, সর্ব্বত্র বিচিত্র সামঞ্জস্য উপলব্ধি করিয়া ও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ পিতৃরূপে অবলোকন করিয়া, অন্তরে ও বাহিরে তাঁহার সান্নিধ্যো-পলব্ধিজনিত আনন্দ লাভ হয়, তাঁহাতে ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় এবং ঈশ্বরোপাসনার যথেষ্ট সহায়তা হয়। ঈশ্বরোপাসক, ধর্ম্মার্থী, সকল নরনারীর ইহা প্রকৃত উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মপরিবারে ইহা পঠিত হউক, ও সকলের নিকট আদৃত হউক।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
[illegible] কর্ত্তৃক ৩৯ নং এন্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 655. March, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ।
৬৫৫ সংখ্যা। } ফাল্গুন, ১৩২৪। মার্চ্চ, ১৯১৮। { ১১শ কল্প।
২য় ভাগ।

স্থলপদ্ম।

মায়ের আমার পদ্ম-চরণ
পড়্‌ল যেথা ধরার গায়,
চিত্তরমণ রক্তকমল
সেথায় ফুটে উঠ্‌ল হায়!

মুগ্ধ হৃদয়-মধুপ আমার
চরণরজঃ-সুবাস-আশে,
পলক-হারা ঘুরে বেড়ায়
স্থলপদ্মের পাশে পাশে!

শ্যামল লতার অন্তরালে
শ্যামল জরীর শাটীর নীচে,
ভক্তবাঞ্ছা কল্প-কুসুম
হাসছে ওই, নয় রে মিছে!

ঘুচ্‌ল সকল ভবের ভাবন,
ঘুচ্‌ল সকল শঙ্কা লাজ,
তৃষ্ণাতুর পরাণ আমার
হ'ল শীতল কমল-মাঝ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

শিবরাত্রি।

এই জগতে কি উচ্চ কি নীচ সকল জাতিই ঈশ্বর-করুণার সমান অধিকারী। জগদীশ্বরের কর্ণে জাত্যহঙ্কারের পটহধ্বনি ক্ষণমাত্র পৌঁছে না, ধর্ম্মকার্য্যের বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার চিত্তকে কিছুমাত্র অনুকূল করে না, জ্ঞানদৃপ্ত তার্কিকের অবিশ্বাস-প্রণোদিত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় তাঁহার মন কিছুমাত্র প্রীতিলাভ করে না, ধার্ম্মিকম্মন্য পণ্ডিতদিগের আত্মাভি-মানপূর্ণ ধর্ম্মকলহে তাঁহার মন কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় না। তিনি চান অভিমান-বর্জ্জিত অকপট হৃদয়ের আড়ম্বরহীন পূজা। এবং তাঁহাকে জানিতে পারুক্ আর নাই পারুক্, জ্ঞানতঃই হউক্, অজ্ঞানতঃই হউক্, যদি কেহ এইরূপ নীরব পূজা তাঁহাকে একবার প্রদান করিয়া থাকে, সে যত নীচকুলোদ্ভবই হউক্ না কেন, যত বড়ই পাপাচারী হউক্ না কেন, তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমা ও কৃপার পাত্র হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। শিবরাত্রি-কথা আমাদিগকে এই কথাই বলিয়া দিতেছে।

বারাণসী নগরে এক ব্যাধ ছিল। তাহার খর্ব্ব ও কৃষ্ণবর্ণ শরীর, পিঙ্গলচক্ষু ও পিঙ্গল কেশকলাপ দেখিয়া সকলেরই মনে ভীতির সঞ্চার হইত। সে সর্ব্বদাই প্রাণিহিংসা করিয়া বেড়াইত। শল্য, পাশ প্রভৃতি প্রাণিহিংসার উপকরণ-সমূহে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ ছিল। একবার ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে সেই ব্যাধ অনেক পশুবধ করিয়া প্রভূত মাংসভার বহন করিয়া আনিতেছিল। সমস্ত দিন অনশনহেতু ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া সে আর সেই ভারবহন করিতে পারিল না। বনমধ্যে এক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়া সে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিল, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; অন্ধকারে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; নিবিড় অরণ্যের পথ নয়নগোচর হইতেছে না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্যজন্তুর ভয়ে সেই মাংসভার লতাপাশ-দ্বারা স্বীয় অঙ্গে বন্ধনপূর্ব্বক সে সেই বিল্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। শীতে তাহার অনাহারক্লিষ্ট দেহ কাঁপিতেছিল, নীহারবিন্দু তাহার শরীর সিক্ত করিতেছিল। আর নিদ্রা আসিল না। সে সমস্তরাত্রি জাগরণ করিয়া রহিল। সেই বিল্ববৃক্ষের মূলদেশে শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান ছিলেন। দৈবক্রমে ব্যাধের গাত্রভ্রষ্ট একটী নীহারবিন্দু সেই শিবলিঙ্গের উপর পতিত হইল, আর সেই পতনোন্মুখ হিমবিন্দুর ভারে একটী বিল্বপত্রও সেই সঙ্গেই বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। সেদিন ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী শিবরাত্রির তিথি। আর সেই দিনেই মহাদেবের অতিপ্রিয়বস্তু বিল্বপত্র ও জল ব্যাধ-দেহ-সংসর্গে শিবলিঙ্গোপরি পতিত হইল। রক্তমাংসস্পৃষ্ট অনাচারী নিষাদের কিছুমাত্র শৌচ ছিল না। সে সমস্ত দিন স্নান করে নাই, কিংবা আড়ম্বর করিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া ষোড়শোপচারে মহাদেবের পূজা করে নাই। অজ্ঞানে সে উপবাসী থাকিয়া মহাদেবের অতিপ্রিয়দিনে তাঁহার অতি-প্রিয়বস্তু তাঁহার মস্তকের উপর ফেলিবার নিমিত্তমাত্র হইয়াছে! তাহাতেই দেবতা প্রীত হইলেন! অজ্ঞাতসারে নিষাদকে সম্পূর্ণ

শিবপূজার ফল প্রদান করিলেন। নিষাদ তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

পরদিন রজনীর অবসানে যখন অরুণ-কিরণ দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া নিবিড় অরণ্যের সেই প্রগাঢ় তিমিরাবরণ উন্মোচন করিয়া দিল, নিশাচর হিংস্র জন্তুসমূহের চিত্তে একটা আলোকভীতি জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের অবাধসঞ্চারে বাধাপ্রদানপূর্ব্বক অরণ্যের বিভীষিকা কিয়ৎ পরিমাণে অপসারিত করিল, তখন উপবাসপীড়িত রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট ক্লান্তকায় নিষাদ ধীরে ধীরে বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিল।

মানুষের জীবন চিরস্থায়ী নহে। কালক্রমে নিষাদের আয়ুঃ শেষ হইল। সমস্ত জীবন ধরিয়া সে অনেক প্রাণিহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়াছে; পুণ্যের ধার দিয়াও যায় নাই। কাজেই ভীষণাকৃতি যমদূত আসিয়া তাহার আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত হইল। যমদূত যখন তাহার আত্মাকে বাঁধিতে যাইতেছিল, ঠিক্ সেই সময়ে এক শিবদূত আসিয়া তাহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল। সে বলিল, "যমদূত, তুমি কাহাকে লইয়া যাইতেছ? আমি যে প্রভু মহাদেবের আদেশে ইহাকে শিবলোকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি।"

যমদূত বলিল, "আমিও প্রভু যমের আদেশে ইহাকে লইতে আসিয়াছি।" এইরূপে উভয়েই নিষাদের আত্মা লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। শিবদূত ও যমদূতে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে শিবদূতই জয়ী হইয়া ব্যাধের আত্মাকে শিব-লোকে লইয়া গেল।

এদিকে যমদূত শিবদূত-কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া যমের নিকট গিয়া সকল কথা নিবেদন করিল। যমও শিবদূতের এইরূপ প্রগল্‌ভতায় বিস্মিত হইয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া একেবারে কৈলাসধামে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারদেশে নন্দীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দিন্, আজীবন পাপাচারী মৃত নিষাদের আত্মাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য আমার দূতকে পাঠাইয়াছিলাম, শিবদূত কেন সে-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল? এবং কোন্ পুণ্যবলেই বা ক্রূরপ্রকৃতি নিষাদের আত্মা যোগিজনবাঞ্ছিত শিবলোক প্রাপ্ত হইল?" যমের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া নন্দী ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, "দেব! আজীবন প্রাণিহিংসক নিষাদ ঘোর পাপী সন্দেহ নাই। কিন্তু সে একদা শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই শিবলিঙ্গের উপর বিল্বপত্র ও জল প্রদান করিয়াছিল। এইজন্যই মহাদেবকৃপায় তাহার আত্মার এইরূপ সদ্গতি হইয়াছে।" এই বলিয়া তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিলেন। যমও নন্দিবাক্যশ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

শিবরাত্রির ব্রতকথা হইতে উপরি উক্ত গল্পটী লিখিত হইল। ঐ ব্রতকথায় দেখিতে পাই;—মহাদেব স্বয়ং পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী আমার অতি-প্রিয়া তিথি। এই তিথিতে যদি কেহ উপবাসী থাকিয়া আমার পূজা করে, তবে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়া থাকি। কেবলমাত্র উপবাসেই আমার যেরূপ প্রীতিসাধন করা হয়, পূজায় তত হয় না। এই তিথিতে উপবাসপূর্ব্বক আমার

জ করিলে গাণপত্য-পদলাভ ও সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ হইয়া থাকে।”

স্কন্দপুরাণের কেদারখণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়েও এই ব্রতের বিবরণ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত ব্যাধের গল্পটী ব্রতকথোক্ত গল্প হইতে কিছু ভিন্ন। তাহাতে উক্ত আছে যে, মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে * চণ্ড-নামে এক দুরাত্মা ব্যাধ সমস্ত দিন মৃগয়ার্থ পরিভ্রমণ করিয়া রাত্রিকালে ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত পীড়িত হইয়া জলাশয়ে একটী শ্রীফলবৃক্ষের উপর আরোহণ করিল। সে হস্তে ধনুক লইয়া সমস্ত রাত্রি নির্নিমিষনয়নে জাগিয়া রহিল এবং মৃগমার্গ অবলোকনের জন্য সম্মুখস্থ শাখাসমূহের বিল্বপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই বিল্ববৃক্ষমূলে এক শিবলিঙ্গ ছিল। দুষ্টস্বভাববশতঃ ব্যাধ তদুপরি এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিল। দৈবক্রমে সেই জল ও ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি, সবই শিরোপরি পতিত হইল। তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শিবপূজা নিষ্পন্ন হইল। প্রভাত হইলে ব্যাধ বিল্ববৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে মৎস্য ধরিতে লাগিল। এদিকে তাহার পত্নী ঘনোদরী, সমস্তরাত্রি অতিবাহিত হইল, তথাপি পতি গৃহে আসিল না, দেখিয়া উৎকণ্ঠায় দিনরাত্রি উপবাসিনী থাকিয়া প্রত্যূষেই পতির জন্য কিছু অন্ন লইয়া তাহার অন্বেষণে বহির্গত হইল। সে যাইতে যাইতে একটী নদীর নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তাহার পতি জালবদ্ধ বহু মৎস্য লইয়া তদভিমুখে আগমন করিতেছে। পতি তাহার নিকট উপস্থিত হইলে সে বলিল, “আমি উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন উপবাসিনী থাকিয়া তোমার জন্য এই অন্ন আনিয়াছি। এস, স্নান করিয়া ভক্ষণ করি।” এই বলিয়া উভয়েই স্নান করিতে গেল। ইত্যবসরে একটা কুকুর আসিয়া সেই প্রস্তুত অন্ন সমস্ত খাইয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে ব্যাধপত্নী কুপিতা হইয়া সেই কুকুরকে মারিতে গেল। কিন্তু অজ্ঞাতসারে শিবার্চ্চনা করিয়া ব্যাধ দিব্যজ্ঞান পাইয়াছিল; সেইজন্য সে পত্নীকে নিষেধ করিয়া বলিল—“কুকুরকে মারিও না। কুকুর অন্ন খাইয়াছে, বেশ করিয়াছে। আমরা অন্ন না খাইয়া মরিব, মনে করিতেছ? জীবন ত চিরস্থায়ী নয়। এই নশ্বর দেহের জন্য মূঢ়েরা কি না করিয়া থাকে? তাই বলি, প্রিয়ে! মান, অভিমান, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিবেকগুণে স্বচ্ছ হও এবং তত্ত্ববোধের উদয়ে স্থির হইয়া থাক।” এইরূপ তত্ত্বালোচনা করিতে করিতে তাহারা সমস্ত দিবস কাটাইল। পরদিন অমাবস্যার দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে শিবপ্রেরিত দূতগণ তাহাদের সমীপে আগমন করিয়া, শিবচতুর্দ্দশী রাত্রিতে, সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া, ব্যাধ যে অজ্ঞাতসারে জল ও বিল্বপত্রে শিবপূজা করিয়াছিল এবং তাহার পত্নী যে পতিচিন্তায় ঐ দিনে উপবাস করিয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ দুইজনকেই বিমানে চড়াইয়া স্বশরীরেই শিবলোকে লইয়া গেল।

এই শিবচতুর্দ্দশী তিথি মহাদেবের অতিপ্রিয়া তিথি। এ-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উক্ত

* ব্রতকথায় ফাল্গুন-মাসের উল্লেখ আছে। ফলতঃ ব্রতোক্ত ফাল্গুনমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ও স্কন্দপুরাণোক্ত মাঘমাসীয় কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথি নহে। সম্ভবতঃ ব্রতকথায় সৌরমাসের গণনানুসারে ‘ফাল্গুন’ ধরা আছে, স্কন্দপুরাণে চান্দ্র মাসের গণনানুসারে ‘মাঘ’ ধরা আছে। দিন ধরিয়া যে মাস গণনা হয়, তাহা সৌরমাস; এবং তিথি ধরিয়া যে মাস-গণনা হয় তাহা চান্দ্রমাস।

আছে যে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যখন এই জগৎ-সৃষ্টি করেন, তখন রাশি-সমন্বিত কালচক্রও উৎপন্ন হইয়াছিল। রাশির সংখ্যা দ্বাদশ; নক্ষত্র সপ্তবিংশতিসংখ্যক। এই রাশি-নক্ষত্রের সাহায্যে কালচক্রান্বিত কাল অবলীলাক্রমে এই জগৎ-সৃষ্টি করেন। কালই এই আব্রহ্মস্তম্ব সমস্ত ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশকর্ত্তা। লোক-সকল এই কালেরই আয়ত্তীভূত। এই জগতে কালই একমাত্র বলবান্ এবং সমস্তই কালাত্মক। প্রথমে কাল বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর লোক-সকলের উৎপত্তি হয় এবং তদনন্তর সৃষ্টিপ্রবৃত্তি ঘটে। সৃষ্টির পর ক্রমশঃ লব, ক্ষণ, নিমিষ, পল, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস ও বৎসরের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। প্রতিপৎ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশটী তিথিই পুণ্য-কালযুক্তা। ইহাদের মধ্যে আবার বিশেষত্ব আছে। পূর্ণিমাতিথি দেবতাদিগের প্রিয়া, অমাবস্যা পিতৃগণের প্রিয়া, অষ্টমী শম্ভুর প্রিয়া, চতুর্থী গণেশের প্রিয়া, পঞ্চমী নাগরাজের প্রিয়া, ষষ্ঠী কার্ত্তিকেয়ের প্রিয়া, সপ্তমী সূর্য্যের প্রিয়া, নবমী দুর্গার প্রিয়া, দশমী ব্রহ্মার প্রিয়া, একাদশী রুদ্রের প্রিয়া, দ্বাদশী বিষ্ণুর প্রিয়া, ত্রয়োদশী যমের প্রিয়া এবং চতুর্দ্দশী শিবের প্রিয়া।

স্কন্দপুরাণে আরও উক্ত আছে যে, এই শিবরাত্রির দিনে শিবশাস্ত্রের আলোচনা শুনিয়াই চণ্ডালপুত্র দুর্ব্বৃত্ত দুঃসহ পরজন্মে বিচিত্রবীর্য্যরূপে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং বিচিত্রবীর্য্যরূপে শিবরাত্রির উপবাস-দ্বারা শিবসাযুজ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল। ভরতাদি বিখ্যাত নৃপগণ শিবরাত্রির ফলেই সিদ্ধিলাভ করেন। এই ব্রতের ফলেই মান্ধাতা, ধন্ধুমারি ও হরিশ্চন্দ্রাদি-নরপতিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, শিবচতুর্দ্দশীব্রত অতিপ্রাচীন-কাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রহিয়াছে।

উপসংহারে ব্যাধের কথা তুলিয়া এই কথাটী বলি যে, ঘোর পাপপরায়ণ অন্ত্যজজাতীয় নিষাদ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই মহাদেবের অতি-প্রিয় পূজোপহার প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়া দুর্লভ শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহা তাহার অদৃষ্টের ফল হইতে পারে। কিন্তু যে ঈশ্বর এইরূপ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে করুণা করিয়া থাকেন, আড়ম্বরহীন পূজাতেই যিনি সন্তুষ্ট, আমরা কেন নিজেদের জ্ঞানগর্ব্ব ও জাত্যহঙ্কারের ঢকা বাজাইয়া, বাহ্যাড়ম্বরের ধ্বজা তুলিয়া নিজ নিজ মহিমার ঘোষণার জন্য পরস্পর ধর্ম্মকলহে মত্ত থাকিয়া, সেই ঈশ্বরকে এত দূরে রাখিয়া দুর্লভ করিয়া ফেলি? মায়াবদ্ধ জীব আমরা মায়াচক্রে পড়িয়া মূল পথ হারাইয়া গিয়া থাকি। ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া আমরা আবার নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি! শিব-রাত্রির কথা আমাদিগকে চৈতন্য প্রদান করুক্।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

গানের স্বরলিপি।

বাঁরোয়া মিশ্র—দাদরা। *

(আমি) মন মজায়ে লুকিয়ে রব
জান্‌তে দেব না,
তফাৎ থেকে বাস্‌ব ভাল
ছুঁতে দেব না।
ঘুর্‌ব তোমার কাছে কাছে
(ওগো) বল্‌বে তুমি কোথায় আছে,
ধরা ধরি করতে গেলে
ধরা দেব না।
দূরে দূরে বাজিয়ে বাঁশী
তোমার প্রাণে ছোঁব আসি,
'আসি আসি' বল্‌ব শুধু,
কাছে যাব না।
বুকের কাছে টেনে নোব,
প্রাণে প্রাণে মিশিয়ে দোব,
চুমুতে ভরিয়ে দেব,
চুমু খাব না—
লুকিয়ে খেলা খেল্‌ব আমি—
খেলায় ভুল্‌ব না ॥

কথা—শ্রী :— সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

১´[ৰ্সা ন্‌া] • ১´ •
II -া ন্‌া ন্‌া। সা সসা ৰ্রা I ৰ্রা পা পা। মা মা জ্ঞা I
• আ মি ম নম জা য়ে লু কি য়ে র ব

১´ • ॥
I জ্ঞা ৰ্রসা ৰ্রণ্‌া। সা সা -া I
জা ন্‌তে ০দে ব না ০

* এই গানটি "নারায়ণ"এর সন ১৩২৪ সালের মাঘ-সংখ্যা হইতে গৃহীত। লেঃ

১ ০ ১´ ০
I মা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পা দা I
ভ কা ৎ থে কে বা স্ ব ০ জা ল ছুঁ

১´ ০
I পা -া পা। পা পা মা I
ত্তে ০ দে ব না ০

১´ ০ ১´ ০
I মা মা মা। মা মা পা I পা পা -া। পা পধণা ণা I
ভ ক্কা ৎ থে কে বা স্ ব ০ জা ল০০ ছুঁ

১´ ০ ১´ ০
I ণা -া দা। পা পা মা I সা ন্া ন্া। সা সসা ঋা I
ত্তে ০ দে ব না ০ ০ আ মি য নম জা

১´ ০ ১´ ০
I ঋা পা পা। মা মা জ্ঞা I জ্ঞা ঋসা ঋণ্া। সা সা -া II
য়ে শু কি য়ে র ব জা নতে ০দে ব না আমি "আমি"

১´ ০ ১´ ০
II পা -পা পা। পা পা -পা I পা পা ধাণ। ণা -া -া I
(১) ঘু র্ ব তো মা র কা ছে ০কা ছে ০ (ওগো)
(২) দূ রে দূ রে বা জি য়ে বা ০০ শী ০ ০
(৩) বু কে র কা ছে টে নে নো ০০ ব ০ ০

১´ ০ ১´ ০
I ণা পপা ধপা। মা মা মা I গা ঋগা মা। মা -া -া I
(১) ব ০ল বে০ তু মি কো থা ০য় আ ছে ০ ০
(২) তো ০মা র০ প্রা ণে ছোঁ ব ০০ আ সি ০ ০
(৩) প্রা ০ণে প্রা০ ণে মি শি য়ে ০০ দো ব ০ ০

১ ০ ১´ ০
I মা ণা ণা। ণা -া ণা I -ধা ধা ধা। পা -া -া I
(১) ধ রা ধ রি ০ ক র্ তে গে লে ০ ০
(২) আ সি আ সি ০ ব ল্ ব শু ধু ০ ০
(৩) চু মু ত্তে ভ ০ রি য়ে ০ দে ব ০ ০

I মা -া মা। গা -া গা I মা -া -া। জ্ঞা রা সা I
(১) শ ০ রা দে ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০
(২) কা ০ ছে যা ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০
(৩) চু ০ ম খা ০ ব না ০ ০ ০ ০ ০০

I সা সসা রা। রা পা -পা I মা মা জ্ঞা। জ্ঞা রসা রণ্া I
লু ০কি য়ে খে লা খে ল্ ব আ মি ০খে লা০

I সা সা সা। সা ন্া -া I -া ন্া ন্া। সা সসা রা I
য ভু ল্ ব না ০ ০ আ মি ম নম জা

I রা পা পা। মা মা জ্ঞা I জ্ঞা রসা রণ্া। সা সা -া II
য়ে লু কি য়ে র ব জা নৃতে ০দে ব না আমি "আমি"

বাজাইবার ঠেকা।

II সা সা রা। সা ণা ধা I মা পা ধা। পা মা গা II
॥ সে যায় যাক্। সে যায় যাক্। না যায় থাক্। হে থায় থাক্ ॥
॥ ধা ধিন্ তাক্। ধা তিন্ তাক্। ধা ধিন্ তাক। ধা তিন্ তাক্ ॥

যুদ্ধ উপলক্ষে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপে এই প্রলয়ঙ্কর পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের স্রোতে পড়িয়া তথাকার অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধ কিংবা তৎসংযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, য়ুরোপের নারীগণ মিলিত হইয়া পুরুষদিগের অনেক কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। নারীগণ নানা সমিতি স্থাপন করিয়া কিরূপ ভাবে শিক্ষা পাইলে দেশের ও নারীগণের মঙ্গল হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন।—বিলাতে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে Land Council of National Political League নামে নারীসমিতি স্থাপিত-হইয়াছে।

কৃষিকার্য্যে নারীশক্তি-নিয়োগ করিবার মানসে কুমারী মার্গারেট্ ফার্গুসন, এম, এ ও কুমারী ব্রডহার্ষ্ট এম-এ, এক কৃষিসমিতি

স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা কিরূপে দেশের খাদ্যাদি দ্রব্যসমূহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে, সে-বিষয়ে চেষ্টা করিতেছেন এবং বিভিন্ন কারখানায় ও কৃষিক্ষেত্রে রমণীদিগকে পাঠাইয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

এই নারী-সমিতির সহিত সরকারী কৃষি-বিভাগের (Board of Agriculture) ও দেশের সমুদয় কৃষি-বিদ্যালয়ের ও কৃষিসমিতির অত্যন্ত সহানুভূতি আছে। গৃহপালিত পক্ষি-প্রভৃতির পালনের জন্য সমিতি একটী কারখানা (Poultry farm) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কারখানায় রমণীদিগকে ঐ বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

রণক্ষেত্রেও সহস্র সহস্র নারী আহত-সৈনিকদিগের সেবায় আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যে-স্থানে অবিশ্রান্ত গোলাগুলি বর্ষিত হইতেছে, সে-স্থানে রমণীগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া সৈনিকদিগের আঘাতের প্রথমাবস্থায় সেবা ও চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতেছেন। হাস-পাতালে স্ত্রীডাক্তারগণ আহতদিগের চিকিৎ-সায় নিয়োজিত হইয়াছেন। রমণীগণ দেশের তাবৎ কার্য্যে পুরুষদিগকে অবসর দিয়া আপনারা তাহাদের কার্য্য গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতেছেন। পুলিসবিভাগে নারী, রেল বিভাগে নারী, কলকারখানায় নারী। নারীগণ সমুদয় কার্য্যের এখন অধিকারী এবং উপযুক্ত বলিয়া গণ্য। (সংগৃহীত)

শ্রীমতী—

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গো ও মহিষ।

গাভী পালন করিতে হইলে উত্তমজাতীয়া গাভী পালন করাই উচিত। নতুবা দুগ্ধ অল্প হইয়া থাকে। ভূয়োদর্শন-দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, উত্তমজাতীয়া গাভী নিম্নজাতীয় বলদের সংস্পর্শে আসিয়া গর্ভধারণ করিলে তাহার প্রসূত সন্ততি মাতার ন্যায় দুগ্ধবতী হয় না। সুতরাং ষাঁড়ও উত্তমজাতীয় হওয়া চাই।

ভারতের মধ্যে হান্সি হিসার, হান্সি-নগর এবং সান্‌হিওয়াল (পঞ্জাব) গাভীগুলি উত্তম-জাতীয় বলিয়া পরিচিত। তাহারা অত্যন্ত দুগ্ধবতী। কাথিওয়াড়-নামক স্থানের গাভী-গুলি প্রথম প্রথম হান্সিহিসারের গাভীর তুল্য দুগ্ধ দেয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের দোষ এই যে, তাহাদিগের দুগ্ধ শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। পঞ্জাবের মণ্টোগোমারী-জেলাস্থিত সান্‌হি-ওয়াল-নামক স্থান হইতে গাভী ক্রয় করাই উচিত। কারণ, এখানে গাভীর উৎকর্ষসাধন করিবার আগার আছে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, হান্সি-হিসারের গাভী প্রত্যহ ২ হইতে ৫ গ্যালন (অর্থাৎ ১০ সের ৪ ছটাক হইতে ২৫ সের ১০ ছটাক) এবং সান্‌হিওয়ালের গাভী ২ হইতে তিন গ্যালন (অর্থাৎ ০ সের হইতে ১৫ সের) পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। উত্তম গাভীর মূল্য ৫০৲ হইতে ১২০৲ টাকা।

জল-বায়ুর গুণে দুগ্ধেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হান্সি-হিসারের গাভী যদি জব্বলপুরে রাখা যায়, তবে তাহার দুগ্ধ কম হইবে; কিন্তু যদি দিল্লীতে রাখা হয়, তবে তাহার দুগ্ধের অধিক বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। এইজন্য হান্সি-হিসারের বকনা ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে অন্য দেশে রাখিয়া তথাকার জলবায়ু সহ্য করান উচিত। সমতল প্রদেশ হইতে যদি পার্ব্বত্য প্রদেশে গাভী লইয়া যাওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ কমিয়া যায়, কিন্তু যদি তাহাকে রীতিমত আহার দেওয়া হয়, তবে তাহার দুগ্ধ অধিক হইয়া থাকে।

মহিষের মধ্যে মুর্‌রা-জাতীয় মহিষই উত্তম। ইহাদিগকে হান্সিহিসার, রোহতক, ঝীণ্ড এবং নাভা হইতে পাওয়া যায়। এখানকার মহিষগুলি উত্তম হয় বলিয়া কলিকাতা, বম্বে, কোয়েটা এবং পেশোয়ার হইতে লোক ইহাদিগকে ক্রয় করিতে আসে। মুর্‌রা মহিষের শৃঙ্গ অত্যন্ত বক্র। ইহাই মুর্‌রার পরিচায়ক। ইহারা প্রত্যহ ১০ হইতে ২৬ কোয়ার্ট পর্য্যন্ত দুগ্ধ দেয়। ইহার অধিক যে তাহারা দুগ্ধ দেয় না, তাহা নহে। তবে সেরূপ মহিষের সংখ্যা অতিবিরল।

অমৃতসহরে দীপমালিকায় এবং বৈশাখ মাসে মহিষ-বিক্রয়ার্থ একটি মেলা হয়। তথা হইতেই লোকে মহিষ ক্রয় করে। জাফিরাবাদের মহিষ উত্তম বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন তাহাদিগের উত্তমতায় বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। রোহতক, দিল্লী এবং হিসার জেলাই অধুনা বম্বেকে মহিষ দিয়া থাকে। সুরাটের মহিষও উত্তম বলিয়া পরিগণিত।

আব্‌হাওয়া যেমন গাভীর দুগ্ধের উপর আধিপত্য করে, মহিষের উপরও অনুরূপ করিয়া থাকে। মুর্‌রা মহিষের জন্য প্রচুর জল ও উত্তম চরাই আবশ্যক।

যদি দুগ্ধবতী গাভী বা মহিষী ক্রয় করিতে হয়, তবে কেহ যেন পয়সার দিকে দৃষ্টি না করেন্। এ-বিষয়ে কার্পণ্য করিলে, পরে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। অনেক লোক সস্তার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিকৃষ্টজাতীয়া গো বা মহিষী ক্রয় করে। ইহা তাহাদিগের ভ্রম। দুগ্ধবতী গাভী যদি উত্তমজাতীয়া হয়, তবে মহার্ঘতা তাহার সমক্ষে অতিতুচ্ছ বস্তু। একটি গাভী প্রত্যহ ২০ কোয়ার্ট (২৫সের) দুগ্ধ দেয়। যদি প্রতিকোয়ার্টের (১ সের ৪ ছটাক) মূল্য দুই আনা রাখা যায়, তবে সে প্রত্যহ আড়াই টাকার দুগ্ধ দিয়া থাকে। আর তাহার পালনে যদি প্রত্যহ এক টাকা খরচ হয়, তবে প্রত্যহ লভ্যাংশ দেড় টাকা, অর্থাৎ মাসে ৪৫৲ টাকা পড়ে। এইরূপে চারিমাসে সেই লভ্যাংশ ১৮০৲ টাকায় দাঁড়ায়। সুতরাং, এরূপ স্থলে গাভীর মূল্য ২০০৲ টাকা দিতে ইতস্ততঃ করা উচিত নহে। কিন্তু কেহ যদি পয়সার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সস্তায় গাভী ক্রয় করে, তবে তাহার কি ফল হইবে তাহাও বিবৃত করিতেছি। একব্যক্তি ৪ সের দুগ্ধদাত্রী একটা গাভীর প্রতি ৪০৲ টাকা খরচ করিল। তাহার দুগ্ধের মূল্য প্রত্যহ আট আনা হয়। এই আট আনা তাহার পালনেই লাগিয়া যাইবে; সুতরাং লাভ কিছুই থাকিবে না। বরং যে টাকা দিয়া গাভীটী ক্রয় করিয়াছিল তাহা উঠিল না বলিয়া সে টাকাটা ক্ষতি হইল।

গাভী হৃষ্টপুষ্টা হইলেই যে দুগ্ধবতী হইবে,

তাহা নহে। গাভীর স্তনও দুগ্ধ বিষয়ে ভ্রমাত্মক। সন্তান দিবার অনতিপূর্ব্বে বা পরে যদি গাভীর স্তন বৃহদাকার হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধবতী বলিয়া বিবেচনা করিও না। স্তনের বর্দ্ধিতাবস্থা অতীত হইলে, গাভী দুগ্ধবতী কি না, তাহার নির্ণয় হইতে পারে।

গাভীর স্তন বৃহদাকার হওয়া চাই; কিন্তু সম্মুখে নাভির দিকে ভার অধিক হওয়া উচিত। পশ্চাৎ হইতে দেখিলে বোধ হইবে যে গাভী অল্পদুগ্ধবতী, কিন্তু সম্মুখের দিকে দেখিলে বোধ হইবে যে স্তনটী একটী থলির মত ও দুগ্ধপূর্ণ। ইহাই উত্তম গাভীর নিদর্শন!

গাভীর চারিটি বাঁটের একের সহিত অন্যটী সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত নহে। ক্রয়কালে বাঁটটী টানিয়া দেখিয়া লওয়া উচিত, তন্মধ্যে কোন কঠিন পদার্থ বা গাঁট আছে কি না। যদি গাঁট থাকে, তবে সে গাভী ক্রয় করা কখনও উচিত নহে। কারণ, পরবর্ত্তী প্রসবে হয়ত, তাহার দুগ্ধনিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। বাঁটে ফোড়া বা আঘাত লাগিলে বাঁটের মধ্যে কাঠিন্য বা গাঁট জন্মে। বাহিরে দেখিলে বোধ হইবে যে, বাঁটে কোন দোষ নাই; কিন্তু বাঁট টানিলেই দোষটী ধরা পড়িবে। অন্ধ বাঁট অন্যান্য বাঁট অপেক্ষা শীর্ণ ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। গাভী যদি শাবক সহিত ক্রয় করা হয়, তবে চারিটী বাঁট দোহন করিয়া লইবে। দোষহীন বাঁটে দুগ্ধ সমানধারে নির্গত হইবে, কিন্তু তাহা দোষযুক্ত হইলে, দুগ্ধ ছিড় কাইয়া বাহির হইয়া থাকে।

গাভী কত দুগ্ধ দিবে, তাহা দুগ্ধ দিবার কালেই নির্ণয় হইতে পারে। গাভীকে একদিন দোহন করিয়া তাহার দুগ্ধের মাত্রা স্থির করিও না, কিন্তু তিন চারি দিন দোহন করিয়া নিশ্চয় করিবে। একবার দোহন করিয়া দুগ্ধ নিশ্চয় করার দোষ এই যে, গাভীর মালিক দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য ২৪ ঘণ্টা না দুহিয়া রাখিয়া দেয়, অথবা অস্থায়িরূপে দুগ্ধ-বৃদ্ধি করিবার জন্য গাভীকে ফেন খাওয়ায়। অপত্যবতী গাভীই দুগ্ধের মাত্রার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বে গাভী ক্রয় করিলে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তিও ভ্রমে পতিত হয়।

গভীর দুগ্ধ নির্ণয় করিবার যে নিয়ম, মহিষেরও তাহাই। তবে কতকটা পার্থক্য আছে। মহিষের দুগ্ধ কেবলমাত্র নবনীত প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, বস্তুর উত্তমতা আবশ্যক। দেশীয় লোকমাত্রই উত্তম দুগ্ধের অত্যন্ত ভক্ত। সুতরাং, বস্তুর পার্থক্য তাহারা সহজেই জানিতে পারে। মহিষ যে কিরূপ দুগ্ধ দিবে, তাহা সন্তান প্রসব করার পরই জানিতে পারা যায়। তিন সপ্তাহ পরে যখন মহিষ পূর্ণমাত্রায় দুগ্ধ দিয়া থাকে এবং পেট ভরিয়া খাইতে পায়, তখনই দুগ্ধ নিরূপণের প্রকৃত সময়। মহিষের দুগ্ধ-শিরা গাভীর দুগ্ধ-শিরা অপেক্ষা বৃহৎ। ইহা যদি আকিয়া বাঁকিয়া স্তনে প্রবেশ করে, তবে তাহা অধিক দুগ্ধের পরিচায়ক। মহিষের স্তন ও বাঁট গাভীর স্তন ও বাঁট অপেক্ষা বৃহৎ। মহিষের পশ্চাতের দুইটী বাঁট সম্মুখের দুইটী বাঁট অপেক্ষা বড়। মহিষ ক্রয় করিতে হইলে সন্তান প্রসব করার পরই ক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নির্ম্মলতা।

সূর্য্যের আলোক ব্যতীত কোন প্রকার জীব বা উদ্ভিদ বাঁচে না বটে, কিন্তু একপ্রকার উদ্ভিদ আছে যাহা সূর্য্যতাপ ও আলোকে মরিয়া যায়। এই পদার্থ অতিক্ষুদ্র এবং বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া থাকে। রৌদ্র এ সমস্ত নষ্ট করে। আমরা দেখিতে পাই, কোন খাদ্যদ্রব্য এক স্থানে ফেলিয়া রাখিলে, তার উপর সাদা সাদা ছাতা পড়ে। এই ছাতাই ঐ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। ঘরেও নানাপ্রকার দ্রব্যে ছাতা পড়ে। ছাতা খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করে। ছাতা অদ্ভুত রকমের গাছ; অল্প সময়ের মধ্যেই তা'র বংশ-বৃদ্ধি হয়। ছাতার বীজ ঘরের ধূলার সঙ্গে মিশে যায়; বিছনা এবং কাপড়-চোপড়ে লাগে। প্রতিদিন ঘর ঝাটাইবে আর ধুইবে, কাপড় ও বিছানা রৌদ্রে দেবে এবং খাদ্যদ্রব্য-সকল ভাল করে ঢাকিয়া রাখিবে।

ছাতা ব্যতীত আর অনেক প্রকার অনিষ্ট-কর বীজ বাতাসে থাকে। সেগুলি মাংস ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য নষ্ট করে। বসন্ত, হাম, ওলাউঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজও আমাদের শরীরে ও গৃহে প্রবেশ করে। এই সমস্ত বিপদ্ হইতে নিজে নিজেদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। সকল প্রকারে পরিষ্কার থাকিলে, যথারীতি বায়ুসেবন করিলে, যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুপক্ক খাদ্য খাইলে এবং যথানিয়মে পরিশ্রম করিলে যে স্বাস্থ্য লাভ হয়, সেই স্বাস্থ্যই আমাদের বলরক্ষক। প্রকৃত সুস্থ ব্যক্তির রক্ত সকল প্রকার রোগবীজ নষ্ট করে। বিধাতার সৃষ্টির প্রণালী ও কৌশল কে বুঝিতে পারে? কিন্তু তিনি আমাদের এতটা বুদ্ধি ও শক্তি দিয়াছেন, যদ্দ্বারা তাঁহার নিয়ম বুঝিয়া চলিলে আমার সুস্থ, সবল ও সুখী থাকিয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে পারি এবং মরণের সময় বিনা কষ্টে মরিতে পারি। কিন্তু তা না করিয়া আলস্য, লোভ এবং রিপুগণের দাস হইয়া থাকিয়া কপালের বিধাতার বা অদৃষ্টের দোষ দিয়া বুক চাপড়ান কেবল কাপুরুষতামাত্র।

মরণের মধ্যেই আমাদের জীবন। নানা-প্রকার রোগবীজ অহর্নিশ সকল স্থানে চলিতেছে! একদিকে দেখিতে গেলে প্রকৃতি আমাদের বিরোধী। তাপ, ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, বিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, আগ্নেয় গিরির অগ্নি-উদ্গীরণ, সমুদ্রের উচ্ছ্বাস, সকলই আমাদের ধ্বংস করিতে নিয়ত উদ্যোগী। আর মানবীয় নীচপ্রকৃতি আমাদের মহাশত্রু। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, লোভ, নানাপ্রকার নীচ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ পরস্পরের কি অনিষ্টই না করে? এই সমস্ত বিরোধিগণকে জয় করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বিধাতা মানুষকে এ শক্তি দিয়াছেন। জগতের সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে একটি অপরি-বর্ত্তনীয় গূঢ় মঙ্গলশক্তি চলিতেছে। সেই শক্তি বিধাতার ইচ্ছা (Divine Will)। সেই শক্তি জ্ঞাত হও, তাহার অনুসরণ কর, সেই ইচ্ছার সঙ্গে আপনার ইচ্ছা মিলাইয়া দাও, দেখিবে তুমি দুর্জ্জয় ব্রহ্ম-সন্তান হইয়া সুখে থাকিবে ও সমস্ত প্রকৃতি তোমার সেবা করিবে।

"আমার পিতার রাজ্য এ বিশ্ব-সংসার
যথা যাই তথা পাই সেবা-উপহার।"

খাদ্য।

হিন্দু-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কলির (বর্ত্তমান সময়) জীবের অন্নগত প্রাণ। কথাটি খুব সত্য।

খাদ্য আমাদের শরীরের জ্বালানি কাঠ। সুতরাং, এই কাঠ ব্যতীত আমাদের দৈহিক অগ্নি কিরূপে রক্ষা পাইবে ? আর আমরাই বা কেমন করিয়া বাঁচিব ?

পান-ভোজন করিলে শরীরের মধ্যে কি হয়, তাহাই একটু বলি। আহারের প্রথম কাজ চর্ব্বণ। খাদ্যদ্রব্যকে চিবাইয়া এবং লালার সঙ্গে মিশাইয়া ঠাসা ময়দার মতন করিয়া লইতে হয়। সেই ঠাসা দ্রব্য (stomach) উদরে বা পাকাশয়ে যায়; তারপর (Bowel) অন্ত্র (Intestine) বা ভুঁড়িতে যায়। এই দুই স্থানে গিয়া নানা-প্রকার রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক হয়। তবে ভেবে দেখ, আমাদের খাদ্য তিনবার রাঁধা হয়; একবার বাহিরে, আর দুইবার উদরে। এইরূপ রন্ধন হইলে খাদ্যের সারাংশ আমাদের (Blood Vessel) রক্তের নলী চুষিয়া লয়। খাদ্যের সারেই রক্ত তৈয়ারি হয়; আর অসার ভাগ মলমূত্র হইয়া বাহির হইয়া যায়। খাদ্য রক্তে পরিণত হয় এবং মাংস, মাংসপেশী (muscles), হাড়, চর্ব্বি, ত্বক্, ও অন্যান্য যন্ত্র প্রস্তুত করে। এখন ভেবে দেখ, অন্নগতপ্রাণ বলা কত সত্য।

আমরা যদি এক দিনরাত উপবাস করি, তবে আমাদের দেহের ভারি একটু কমে যায়। কারণ, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে আমাদের দৈহিক অগ্নি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পুড়াইয়া ফেলে। উপবাস করিলে চক্ষু ও হাত-পা যে জ্বালা করে, তাহার কারণ—ঐরূপ দহন। দীর্ঘ উপবাসে মানুষ মরিয়া যায়। নিয়মিতরূপে যথাপরিমাণে খাইলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি।

কিরূপ খাদ্য খাইতে হয়, তাহা এখন বলি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খাদ্য-দ্বারাই রক্ত, মাংস, অস্থি ইত্যাদি সকলই জন্মে। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান থাকা চাই। করুণাময় বিধাতা আমাদের জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন্। সমস্ত জড়, উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সর্ব্বদা আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে।

সকল প্রকার উপাদান একই প্রকার খাদ্যে পাওয়া যায় না। সেজন্য আমাদের বিবিধ-প্রকার খাদ্য খাইতে হয়। কিন্তু দুই প্রকার খাদ্য আছে যাহাতে সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়।—দুগ্ধ ও পক্ষীর ডিম্ব। দুগ্ধ রক্ত হইতে জন্মে, তাই রক্তের সমস্ত উপকরণই ইহাতে আছে। মা'র দুগ্ধ মানবশিশু ও নানা-জাতীয় পশু-শাবকের প্রথম খাদ্য—শিশু-খাদ্য—বলিয়া অতিতরল। দুধে ৮১ হইতে ৯০ ভাগ জল, আর বাকি কয়েক ভাগ সার। দুধে একটু দম্বল দিলে দই হয়; দই মরিলে মাখন বাহির হয়। মাখন উঠাইয়া লইলে যাহা থাকে, তাহাই ঘোল। শরীরের পক্ষে ঘোল বড় উপকারী। ইহার দ্বারা অনেক রোগবীজ নষ্ট হয়। ঘোল দই অপেক্ষা লঘু। সেইজন্য পেট-রোগাদের ইহা উত্তম পথ্য। আবার দুধ জ্বাল দিতে দিতে তাহাতে একটু ঘোল বা দই দিলে অনেকটা ছানা হইয়া উপরে ভাসে। আর তলায় অনেকটা জলের

যতন যে জিনিষ থাকে, তা'র নাম Whey বা ছানার জল। ছানার সঙ্গে কতকটা মাখন মিশে যায়, আর কতকটা মাখন ছানার জলের সঙ্গে থেকে যায়। ছানার জলে আরও অনেক পদার্থ থাকে। জ্বাল দিলে ইহা হইতে চিনি বাহির হয়। কেবল তাহাই নয়। খুব জ্বাল দিয়ে জলভাগ উড়াইয়া দিলে একপ্রকার সাদা সাদা গুড়া পাওয়া যায়। তাহা ছাই বা একপ্রকার লবণ। এখন জানা গেল, দুধে এই কয়েকটী দ্রব্য পাওয়া যায়:—যথা, জল, চিনি, লবণ, স্নেহপদার্থ (fat) এবং ছানা। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজমোহন বসু।

তপস্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৮)

সন্ধ্যাকালে সুধীর রোগী দেখিয়া গ্রাম হইতে ফিরিতেছে, এরূপ সময়ে পথিপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বাটী হইতে একটা মর্ম্মভেদী আকুল আর্ত্তনাদ ও কাতরক্রন্দন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহা শুনিয়াই সুধীরের প্রাণে সহসা কেমন দয়ার সঞ্চার হইল। সে প্রকৃত তথ্য নির্ণয়-হেতু আপনার সহিস্‌কে উক্ত বাটীতে পাঠাইয়া দিল। সহিস্ আসিয়া সংবাদ দিল, যোগেশচন্দ্র বসু নামক জনৈক রেল-কর্ম্মচারীর প্লেগে মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার স্ত্রী ঐরূপ কাঁদিতেছেন। বাটীতে অপর আত্মীয়ও কেহ নাই। এই কথা শুনিয়া সুধীর ভাবিল, গৃহস্বামী মৃত; কার্য্যোপলক্ষে বোধ হয়, পরিবার লইয়া তিনি এখানে ছিলেন। এখন এই বিদেশে একা বাঙ্গালীর মেয়ে এ মৃত ব্যক্তিকে লইয়া কি করিবে? যদি তাহার কোনও উপকার করিতে পারে, এই মানসে সুধীর তাহার গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু অপরিচিত পুরুষ একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সম্মুখে যাইবেই বা কিরূপে! ভাবিয়া চিন্তিয়া সুধীর তাঁহার সহিস্‌কে অন্দর মধ্যে গিয়া এই খবর দিতে বলিল যে, "বল্‌গে যা, ডাক্তারসাহেব একবার দেখ্‌তে চান্।"

সহিস্ ভিতরে গিয়া সংবাদ দিলে গৃহস্বামিনীর দাসী আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া সুধীরকে বলিল, "সাহেব, আউর ক্যা দেখে গা? আদ্‌মী ত মর্ গিয়া!"

সুধীর বলিল, "তা আমি শুনিছি। মৃতদেহের সৎকারের তোমরা কি কর্‌ছ? শুন্‌লুম, তোমাদের বাড়ীতে আর কেউ নেই! যদি তোমাদের কোন উপকার হয়, তাই এসেছি।"

দাসী সুধীরের বাক্য শুনিয়া বাটীর মধ্যে এই সংবাদ দিল, এবং অনতিবিলম্বে সুধীরকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে লইয়া গেল।

সুধীর কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, একটী প্রৌঢ় মহানিদ্রায় নিমগ্ন। সংসারাসক্তির লেশমাত্রও তাহাতে লক্ষিত হইতেছে

না ! সে আজ নির্ব্বিকার ! নিশ্চল নিস্পন্দ জ্যোতির্হীন দেহখানি আজ শয্যোপরি নিঃসাড়ভাবে পতিত রহিয়াছে ! সুধীর ভাবিল, কি বৈচিত্র্য ! ক্ষণপূর্ব্বে যাহার কত আশা, কত উৎসাহ, কত সুখকল্পনা, কত উদ্যম, মৃত্যুর দুর্নিবার যবনিকা আসিয়া মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহার সে-সমস্তই লুক্কায়িত করিয়া ফেলে ! কি আশ্চর্য্য ! নিমেষে সুধীরের দৃষ্টি অনাবদ্ধ-বেণীকা, শোকে মুহ্যমানা, অসংযতবাসা, অনাহার- ও রাত্রিজাগরণ-ক্লিষ্টা, পতিশয্যা-বিলগ্না, ভূলুণ্ঠিতা, রোরুদ্যমানা, তারুণ্য-সৌন্দর্য্যশোভিতা, রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুধীর দেখিল যোগেশের পত্নী ষোড়শবর্ষীয়ার অধিক হইবে না—সে তরুণী ! তাহার অবস্থা স্মরণ করিয়া সুধীরের চক্ষে জল আসিল। সে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহই নিকটে নাই। বালিকা মৃতস্বামীকে লইয়া বিপৎসাগরে পতিত হইয়াছে ! তাহাকেই বা রক্ষা করে কে ? স্বামীর সৎকারই বা কিরূপে হয় ? সংসারানভিজ্ঞ ক্ষুদ্র রমণী একে পতিশোকে কাতরা, তাহার উপর এই সকল দুশ্চিন্তায়, সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না ! একমাত্র ক্রন্দন ও হিন্দুস্থানী দাসী তাহার সহায়। এইরূপ চিন্তাভারে যখন সে পীড়িতা, তখন সহসা সুধীর তথায় উপস্থিত হইলেন। সুধীরকে দেখিয়া শোকাপহৃতলজ্জা রমণী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া, মস্তকের কাপড় উঠাইয়া দিল। অজ্ঞাতসারে সুধীরের নয়নযুগল বারেক রমণীর মুখমণ্ডল দেখিয়া লইল ! সুধীর তদ্দর্শনে বিস্মিত হইল ! তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন এ মুখ তাহার অতি-পরিচিত ! যেন রমণীকে সে কোথায় দেখিয়াছে ! কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে, কি-সূত্রে দেখিয়াছে, তাহা সে স্মরণ করিতে পারিল না।

যাহা হউক্, মনের কৌতূহল মনে দমন করিয়া সত্বর সুধীর যোগেশচন্দ্রের সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া দিল, এবং তাহার পর রমণীর জন্য সে বিশেষভাবে চিন্তিত হইল। সর্ব্বাগ্রে তাহার এই চিন্তার উদয় হইল, বিদেশে যুবতী রমণী একাকিনী কাহার কাছে থাকিবে ? তাহার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, সুধীর ত তাহা কিছুই জানে না ! কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় সুধীর সাতপাঁচ ভাবিয়া রমণীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে এখানে ছিলেন। কিন্তু তিনি ত এখন সংসারের সকল মমতা পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছেন ; আপনি একা কিরূপে এখানে বাস কোর্‌বেন ? আপনার আত্মীয়বন্ধু কে কোথায় আছেন, বলুন, তাঁদের সংবাদ দিই ; তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবেন !"

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "শ্বশুর-বাড়ীতে ত আমার এমন কেউ নেই যে, আমাকে নিয়ে যাবে ! আমার বাপের বাড়ীতে অনুগ্রহ ক'রে আমার দাদাকে খবর দিন্।"

"ঠিকানা বলুন" বলিয়া পকেট হইতে 'নোট্‌বুক' বাহির করিয়া সুধীর ঠিকানা লিখিয়া লইতে লাগিল।

রমণী বলিল, "অতুলকৃষ্ণ মিত্র—৩৬ নং চোরবাগান।"

সুধীর বিস্ময়সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "অতুল মিত্তির ! চোরবাগান ?"

রমণী বিনীতভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ"।

সুধীর পুনশ্চ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি বিভা?"

যুবতী বিস্মিতা হইল। বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "আপনি আমার নাম জান্‌লেন কি করে?"

সুধীর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "বিভা, বিভা, পাষাণে প্রাণ বেঁধে তোমার বিবাহ দেখেছিলুম! আবার ঘটনাচক্রে চক্ষের উপর তোমার বৈধব্যও আমাকে দর্শন কর্ত্তে হল!"

এই শোকের মধ্যেও বিভার মনে বিলক্ষণ কৌতূহল জন্মিল। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি? আমি ত আপ্‌নাকে চিন্‌তে পাচ্ছি না!"

সুধীর। আমি কিছুদিন তোমাদের পাড়ায় ছিলাম। অতুলের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। তুমি তখন খুব ছেলে মানুষ। বোধ হয়, তোমার মনে নেই—আমার নাম সুধীর।

বিভা। (আশ্বস্ত ভাবে) ওঃ—আপনি এখানে! বোধ হয়, ভগবান্ দয়া করে আমার এ বিপদের সময় আপ্‌নাকে পাঠিয়েছেন।

সুধীর বলিল, "বিভা, যখন তোমার পরিচয় পেলুম, তখন আর তোমাকে ত একলা এখানে রেখে যেতে পারি না। এখন আমার বাসায় চল। তারপর অতুলকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি; সে এসে তোমায় নিয়ে যাবে।"

এ প্রস্তাবে বিভা সম্মতা হইল। সম্মত না হইয়া সে করে কি? বিদেশে সে একাকিনী বালিকা মহাবিপদেই পতিত হইয়াছে! জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন স্রোতের মুখে কাষ্ঠখণ্ড পাইলেও তদবলম্বনে জীবনরক্ষা করিতে প্রয়াস পায়, বিভাও তদ্রূপ সুধীরকে পাইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

(১৯)

একদিন দুইদিন করিয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, তথাপি অতুল আসিয়া পৌঁছিল না; কিম্বা তাহার কোনও সংবাদও পাওয়া গেল না! সুধীর আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ভাবিল, এ ব্যাপার কি! এরূপ সংবাদ পাইয়া আত্মীয়-বন্ধু কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে?

বিভা প্রত্যহ সুধীরকে জিজ্ঞাসা করে, "দাদার কোনও পত্র এসেছে কি?" সুধীরও প্রত্যহই তাহার উত্তর দেয়, "কাল আস্‌বে।" যদিও সুধীর বিভাকে "কাল আস্‌বে" বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিত, কিন্তু নিজে সে অতুলের জন্য বড়ই চিন্তিত হইল।

সুধীর অতিযত্নেই বিভাকে স্বগৃহে স্থান দিয়াছিল। তাহার জন্য একজন দাসী এবং একটী কক্ষও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। নিজে অবসর পাইলেই বিভার কাছে বসিয়া তাহার শোকাপনোদনের জন্য সে গল্প করিত, কখনও বা সংবাদপত্র পাঠ করিয়া বিভাকে শুনাইত, এবং কখনও বা ইউরোপ প্রভৃতি যে সকল দেশ সে দেখিয়াছে, সেই সকল দেশের বর্ণনা করিত।

উভয়ের এইরূপ একত্রে অবস্থান উভয়েরই, বিশেষতঃ বিভার পক্ষে যে কতটা অনিষ্টকর হইতে লাগিল, তাহা উভয়ের কেহই উপলব্ধি করিতে পারিল না। বিভার বিবাহ হইয়া-

ছিল সত্য; কিন্তু দশবৎসরের পাত্রীর ৪৫ বৎসরের পাত্রের সহিত বিবাহে কখনও দাম্পত্যপ্রণয় জন্মিতে পারে না। বিবাহের পর কয়েক বৎসর বিভা স্বামীর সহিত বাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? প্রকৃত প্রেম যে বস্তু, তাহা বালিকা তাহার স্বামীর প্রতি কোনও দিন অর্পণ করিতে পারে নাই বা শিখে নাই। গুরুজন বলিয়াই যোগেশকে সে শ্রদ্ধা করিত, রক্ষাকর্ত্তা বলিয়াই যত্ন ও সেবা করিত, কিন্তু যোগ্যা পত্নী যাহাকে বলে, তাহা সে হইতে পারে নাই। যোগ্যপত্নী কাহাকে বলে, তাহা বিভার অবিদিতই ছিল। তাই বিভা সুধীরকে দর্শনমাত্র সম্পূর্ণ অজ্ঞাতভাবেই আপন অন্তরে নরকাগ্নি জ্বালিতে আরম্ভ করিল। বিভা সুধীরের রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইল। সে মনে মনে ভাবিত, বাবা যদি তখন সুধীরের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে আপত্তি না করতেন, তা'হলে এই রুগ্ন, বৃদ্ধ, জীর্ণ স্বামীর পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর স্বামী, ও এত সুখ ঐশ্বর্য্য, সমস্তই আমার হইত!"

বিধবা যুবতীর এরূপ চিন্তা মনে আনাও যে পাপ, তাহা বিভার অন্তরে উদয় হইত না। ষোড়শবর্ষীয়া তরুণী সংসারের কুটিল গতি-বিধির জানেই বা কি! সংসারের ভোগ-লালসার বাসনা তাহার ত কিছুই নিবৃত্তি হয় নাই। অকালে সমাজের স্বেচ্ছাচারে এরূপ রমণীকে ধরিয়া বাঁধিয়া ব্রহ্মচর্য্যের মন্ত্রদান করিলে, সে মন্ত্র তাহার অন্তরস্পর্শ করিতে পারে কি? অনেকেই হয় ত বলিবেন, "ষোল বছরের মেয়ে নেহাৎ কচি খুকিটি নয়; তাহার বুঝিয়া চলা আবশ্যক।" কিন্তু এ আবশ্যক কয়জনে বুঝে? কত পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের অন্তরেও ভোগবিলাসের স্রোত প্রবাহিত! আর ষোল বৎসরের তরুণী যুবতীর প্রাণে যে এ বাসনা উদয় হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ব্রহ্মচর্য্য-পালন স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এ কর্ত্তব্য পালন করিলে, দেশের আজ এ দুর্দ্দশা কেন?

সুধীর বাল্যকাল হইতেই বিভাকে মনে মনে যথার্থ ভালবাসিত। বিভার বৃদ্ধ পিতৃতুল্য বরের সহিত বিবাহ হওয়ায় তাহার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। এবার বিভার বৈধব্য-দর্শনে তাহার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। সে মনে মনে স্থির করিল যে, আপনি হিন্দুশাস্ত্র মতে বিভাকে বিবাহ করিয়া বিভার এ দুঃখজ্বালা দূর করিয়া দিবে এবং তাহাতে তাহার নিজেরও অভিষ্টসিদ্ধি ঘটিবে। কিন্তু অতুলের না আসা পর্য্যন্ত সে এ প্রস্তাব বিভার নিকটে উত্থাপন করিতে সাহস করিল না। সে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত; বিধবা-বিবাহে কোনও দোষ মনে করিল না। ভবিষ্যদ্‌-দৃষ্টিহীন যুবক সমাজের রীতি-নীতি জানিয়াও এ দুরাশা হৃদয়ে দিন দিন পোষণ করিল।

লীলার কথাটি যে সুধীর একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহা নহে। সুধীর পূর্ব্বাভিমান স্মরণ করিয়া ভাবিল, "লীলা! লীলা আমার কে? কেউ নয়! তার বাপ্‌ আমায় বড় অপমান ক'রেছে। তার একটা বড় রকম প্রতিশোধ নেওয়া চাইই! বিভাকে বিয়ে করলেই তার উচিত প্রতিবিধান হ'বে। এত স্পর্দ্ধা! মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে দেবে না! আর লীলা! লীলারই

কি বড়মানুষের মেয়ে বলে মনে অহঙ্কার নেই? হাঁ, আছে বই কি! না হ'লে তার বাপ্ কি এতটা সাহস কর্‌ত? থাকুক্ সে তার বড়মানুষ বাপ নিয়ে;—আমি তাকে চাই না! সে তার পথ চিনেছে, আমিও আমার পথ বেছে নেব!"

হায় বাঙ্গালী যুবক! তোমাদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে ধিক্! তোমাদের দেশহিতৈষিতাকেও ধিক্। তোমরা গৃহের হীরকখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের চাক্‌চক্যময় কাচখণ্ডের অন্বেষণ কর। দেশহিতৈষণার ভান করিয়া স্বার্থসিদ্ধির আশায় লালায়িত হও!

একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময়, সুধীর তাহার বিশ্রাম-কক্ষে একখানি 'কৌচের' উপর শয়ন করিয়াছিল এবং বিভা পা ছড়াইয়া ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া সেই কক্ষতলে বসিয়াছিল। সুধীর গল্প করিতেছিল, বিভা একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছিল, অথবা সুধীরের রূপসুধা পান করিতেছিল কি না, তাহা সেই জানে।

এরূপ সময় একব্যক্তি সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়া উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল। বলা-কহা নাই, একেবারে ডাক্তার-সাহেবের বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ! কি সাহস! লোকটা কে? একেবারে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া সে গৃহ-প্রবেশ করিল! আগন্তুক সুধীরের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিভা তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। সুধীরের এবংবিধ ভাব দেখিয়া আগন্তুক বলিল, "সুধীর, আমায় চিন্‌তে পার্লে না?"

তখন সুধীর উঠিয়া আগন্তুকের হস্ত ধারণ করিয়া সযত্নে তাহাকে 'কৌচের' উপর বসাইল। এতক্ষণ পরে বিভা "দাদাগো" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আগন্তুক অতুল। সে যথাসময়ে সুধীরের টেলিগ্রাম পায় নাই। সুধীর যখন টেলিগ্রাম করিয়াছিল, অতুল তখন বাটীতে ছিল না। মানুষের বিপদ্ যখন আসে, তখন তাহা উপর্য্যুপরিই আসে। বিপদ্ কখনও একাকী আসে না। যে সময়ে যোগেশচন্দ্র মারা যান্, ঠিক্ ঐ সময়েই অতুলের আর একটী ভগ্নী-পতি মারা যায়। অতুল সেই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি সেইখানে চলিয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থাভাব-হেতু অতুলের পিতা কোন কন্যাকেই উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিতে পারেন নাই। সকলেই দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ের হাতে পড়িয়াছিল। অতুলের এই ভগ্নীপতিটিও দ্বিতীয় পক্ষে বার্দ্ধক্যের আহ্বান শুনিতে শুনিতে অতুলের ভগ্নীটীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের অনেকগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলে-মেয়ে ছিল। তাঁহার যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল, তিনি মারা যাইবামাত্রই, তাঁহার পূর্ব্বপক্ষের পুত্রেরা তাহা লইয়া তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে মহা বিবাদ বাধাইয়া দিল। অতুল গ্রামের পাঁচজন ভদ্রলোক ডাকাইয়া তাহাদের সম্পত্তি-ভাগ করিয়া দিল। এই সকল কারণে অতুলের সেখানে কয়েক দিন বিলম্ব হইল। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতুল সুধীরের টেলিগ্রাম পাইল। তখন দুঃখের উপর দুঃখ, বিপদের উপর বিপদ্ জানিয়া, বাড়ীতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সুধীরের টেলি-গ্রামখানি গোপনে রাখিয়া, অতুল বিভাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লাহোরে আসিলেন।

অতুল বলিল, "সুধীর, তুমি এত বড়লোক হয়েও যে গরীবের উপর তোমার এত দয়া, এত স্নেহ—এইটেই তোমার যথার্থ মহত্ত্ব। তুমি যে উপকার করেছ, তোমার সে ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পার্ব্বো না।"

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, "মানুষের বিপদে মানুষকে দেখা, মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। এতে আর মহত্ত্বই বা কোন্‌খান্‌টায়, দয়াই বা কোন্‌খান্‌টায় দেখ্‌লে তুমি?"

সুধীরের অনুরোধে অতুল কয়েকদিন লাহোরে থাকিল। দুই বন্ধুতে পূর্ব্বের ন্যায় আবার একত্রে আহার, একত্রে বিহার ও এক সঙ্গে শয়ন করিয়া এ দুঃসময়ের মধ্যেও বড় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিল। সুধীরের ইচ্ছা হইতেছিল না যে, অতুলকে যাইতে দেয়। কিন্তু অতুল আফিসের কেরাণী। তাহার নির্দ্দিষ্ট ছুটি ফুরাইয়া আসিল। তাহার আর থাকিবার উপায় নাই। এ দিকে যোগেশ-চন্দ্রের শ্রাদ্ধাদিরও সময় নিকটবর্ত্তী। কাজেই, অতুলকে বাধ্য হইয়া সুধীরের নিকটে বিদায় লইতে হইল।

সুধীর বিভাকে বিবাহ করিবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হইয়াছিল। কিন্তু অতুলের কাছে একথা "বলি" "বলি" করিয়াও সে বলিতে পারে নাই। কেমন একটা সঙ্কোচ, একটা লজ্জা তাহার জিহ্বায় জড়তা আনিয়া দিতেছিল। একদিন কিন্তু অবসর বুঝিয়া সে অতুলের নিকট নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিল। অতুল বিচক্ষণের ন্যায় সুধীরের সকল কথা মনোযোগ-সহকারে শুনিল এবং তাহার পর ধীর ও সংযতভাবে বলিল, "ভাই, তুমি এ বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার মত যুবকের বিবাহের ভাবনা কি? একটা কেন, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, সমাজ হয়ত দশটা মেয়ে তোমার গলায় দিতে প্রস্তুত হবে! যাক্‌ সে-কথা। তুমি নিজেই ভেবে দেখ ভাই, তোমার গলায় মালা দিতে পারলে কত কুমারী কৃতার্থ হবে। তোমার হাতে মেয়ে দিতে পারলে কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও আপনাকে সৌভাগ্যবান্‌ মনে করবেন। তুমি কেন ভাই, বিধবাকে বিয়ে ক'রে সমাজের কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হ'বে?"

সুধীর সগর্ব্বে বলিল, "সমাজ! যে সমাজের আইন কেবল রমণী-নিগ্রহ, তেমন সমাজকে আমি গ্রাহ্যই করি না।"

অতুল। তুমি না করলেও আমাদের, ভাই, গ্রাহ্য করতে হয়। বিধবার বিয়ে দিয়ে যে একজনের জন্যে আমরা সকলে সমাজের কাছে নতমস্তকে থাকব, ততটা মনের বল আমাদের এখনও নেই!"

অতুলের কথা শুনিয়া সুধীর শিহরিয়া উঠিল। কি নিষ্ঠুরের মত কথা! ওঃ—অভাগিনী বাল-বিধবাদের মুখ চাহিতে কি এদেশে কেউ নেই? সে প্রকাশ্যে বলিল, "কেন অতুল, এতে দোষটা কি? হিন্দু-শাস্ত্রেও ত বাল-বিধবার বিবাহের বিধি আছে। এই সব ছোট ছোট মেয়েদের এত নিগ্রহ না করে,—তাদের পুনর্ব্বার বিবাহ দেওয়া কি উচিত নয়? ইয়োরোপ প্রভৃতি সকল দেশেই দেখ, বিধবা-বিবাহের চলিত আছে। আমাদের দেশেও এ-রকম বিবাহ ত হয়ে গেছে।"

অতুল। ভাই, ইয়োরোপে বাস ক'রে তোমার মন যত উন্নত ও সাহসী হয়েছে,—আমরা গরিব বাঙ্গালী, আমাদের ততটা

সাহস নেই। আর হিন্দুনারীর দু'বার বিবাহের চেয়ে হিন্দুবিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালনটাই আমাদের কাছে অতিমহৎ কার্য্য বলে মনে হয়। আমাদের এই কলিযুগে বর্ত্তমান বিলাস-পঙ্কিল দেশে যা একটু মহত্ত্ব, যা একটু উদারতা, যা একটু পবিত্রতা ও যা একটু ধর্ম্মভাব দেখ্‌তে পাই, তাত কেবল আমাদের এই ব্রহ্মচারিণী হিন্দু-বিধবাদের হৃদয়ে। বাস্তবিক পূতচরিত্রা এই রকম বিধবা দেখ্‌লে আমার প্রাণে বড় আনন্দ হয়। আমি বিভাকে সেই ভাবে গঠিত কোর্ব্বো; তাকে হিন্দু বিধবার আদর্শ কর্‌বার জন্যে যত্ন কোর্ব্বো। তার আবার বিবাহ দিয়ে সমাজে পতিত হতে পারব না, ভাই! তুমি আমায় ক্ষমা কর।

সুধীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নীরব রহিল। আর তাহার বলিবার কি আছে? তাহার আশালতা অঙ্কুরেই নির্ম্মূল হইয়া গেল। একটা নিরাশার গভীর হাহাকার হৃদয়-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়া ধীরে ধীরে তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া বহির্গত হইতে লাগিল।

অতুল আবার বলিতে লাগিল, "সুধীর! বিভা এমন কি তপস্যা করেছে যে, সে তোমার মতন স্বামী লাভ কর্‌বে? তোমার কি মনে নেই, আমি গোড়াতেই তোমার সঙ্গে তা'র বিয়ে দেবার জন্যে বাবাকে কত বলেছিলুম? তুমিও ত তাকে বিবাহ কর্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু তোমরা বঙ্গজ আর আমরা রাঢ়ী, শুধু এইটুকুমাত্র আপত্তির জন্যে সমাজের ভয়ে বাবা তখন তোমার সঙ্গে বিভার বিবাহ দিতে পারেন নি! যদি তা তখন দিতেন, তা হ'লে বৃদ্ধ যোগেশবাবুর পরিবর্ত্তে তোমার মত সর্ব্বগুণান্বিত যুবকের পত্নী হয়ে বিভা আজ অপার সুখভোগ কর্‌ত। কিন্তু অভাগিনীর কপালে সে সুখ নাই! বিধাতার ইচ্ছা অন্যপ্রকার। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এখন আর সে-কথা নিয়ে আন্দোলন করা বৃথা!

অতুল সেইদিনেই তাড়াতাড়ি বিভাকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার আশঙ্কা হইল, পাছে বিভার মনে কোন রকম বিকৃত ভাব ঘটিয়া থাকে।

সুধীর ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়া ভ্রাতা-ভগ্নীকে ট্রেনে তুলিয়া দিল। ট্রেন হু-হু-শব্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। সুধীর একটা নিরাশার গুরু বেদনা বক্ষে লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

(২০)

আমাদের দেশে একটা মেয়েলি প্রবচন আছে যে, "ভালবাস কেমন? না, ভালবাস যেমন।" অর্থাৎ ভালবাসা ভালবাসাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সকল স্থানে সে কথাটা খাটে না। মাতা পুত্রগতপ্রাণা; কিন্তু কত কুসন্তান আছে, যে মাতার সে-স্নেহের বিন্দুমাত্র প্রতিদান করে না! কত পতিপ্রাণা রমণী পতির ধ্যানে জীবনপাত করিতেছে, কিন্তু নিষ্ঠুর পতি সেই সাধ্বীর প্রতি ফিরিয়াও চাহে না! কত ভগিনীর হৃদয় ভ্রাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ, কিন্তু ভ্রাতা হয় ত, ভগ্নীকে দেখিলে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়! সংসারে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

সুধীর ভ্রমেও তাহার পরিণীতা ভার্য্যা লীলার কথা মনে করে না, কিন্তু লীলার

প্রাণ সুধীরময়। লীলা শয়নে স্বপনে, চিন্তা-জাগরণে, ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে সুধীর ব্যতীত আর কিছুই জানে না। অহর্নিশ সুধীরের প্রতিমূর্ত্তিরই সে পূজা করে।

পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমানী যুবক কিছুতেই বুঝিল না যে, পবিত্র প্রেম-ভরা একখানি হৃদয় প্রাণভরা ভালবাসা ও হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া তাহারই মহাপূজার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে! নির্ব্বোধ যুবক তাহা না বুঝিয়াই, ব্যর্থ ক্রোধ লইয়া সংসারের এক-প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া মনের আগুনে আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে! তাহার গৃহে স্বর্গীয় বিমল সুধা অযত্নে অনাদরে গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে বিষ-পানের আশায় উন্মত্ত হইয়া প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে!

কমলাপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া লীলা একেবারে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উত্থানশক্তি আর নাই বলিলেই হয়। দুঃখে, মর্ম্মবেদনায়, হতাশতায়, তাহার হৃদয় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লীলার এই অবস্থা দেখিয়া অবিনাশবাবু বড়ই ব্যথিত। বাস্তবিকই, তিনি লীলাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাহার জন্য তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে লীলার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন, বটে, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না! এমন কি রোগ-নির্ণয়ে কেহই সমর্থ হইলেন না। শেষে সকলেই এক-মতাবলম্বী হইয়া নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। হায়! মনের বিকার ঔষধে কি উপশমিত হইবে? কাজেই, লীলার পীড়ার কোনও উপশম হইল না। আর সে ঔষধ সেবনও করিত না। তাহার বাসনা, যদি সুধীরের সহিত তাহার মিলনই না হইল, তবে যেরূপে হউক, দেহ হইতে জীবনটা বহির্গত হইয়া যাউক্।

বিখ্যাত বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া লীলার জন্য যে-সব ঔষধ আসিত, লীলা তাহা আদৌ খাইত না। ঔষধগুলি বাতায়নপথ দিয়া কার্ণিসে, রাজপথে, অথবা পিকদানীতে স্থান পাইত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, 'খাইয়াছি।' কেহ যদি ঔষধ খাওয়াইতে আসিত, লীলা তাহাতে বড় বিরক্ত হইত; বলিত, "থাক্, আমি নিজেই খাব এখন।"

চিকিৎসকগণ যখন লীলার পীড়ার কিছু উপশম হইতে দেখিলেন না, তখন সকলে এক-মত হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

চিকিৎসকগণ যখন লীলার চিকিৎসা ছাড়িয়া "চেঞ্জের" ব্যবস্থা করিলেন, তখন অবিনাশবাবু লীলার জীবনসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইলেন। যাহা হউক, "যা করেন ভগবান্" এই বলিয়া তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন হইল যামিনীবাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। অবিনাশবাবু লীলাকে লইয়া সেইখানেই যাইতে মনস্থ করিলেন। কারণ, লীলা তাহার কাকাকে বড় ভালবাসে। কাকার সঙ্গে বেড়াইতে, কাকার কাছে গল্প করিতে লীলার বড় আনন্দ হয়। লীলার যাহাতে মন ভাল থাকে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাই অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর কাছে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

প্রাণ সুধীরময়। লীলা শয়নে স্বপনে, চিন্তা-জাগরণে, ধ্যানে জ্ঞানে প্রাণে সুধীর ব্যতীত আর কিছুই জানে না। অহর্নিশ সুধীরের প্রতিমূর্ত্তিরই সে পূজা করে।

পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাভিমানী যুবক কিছুতেই বুঝিল না যে, পবিত্র প্রেম-ভরা একখানি হৃদয় প্রাণভরা ভালবাসা ও হৃদয়ের সমস্ত আবেগ লইয়া তাহারই মহাপূজার জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে! নির্ব্বোধ যুবক তাহা না বুঝিয়াই, ব্যর্থ ক্রোধ লইয়া সংসারের এক-প্রান্তে পড়িয়া থাকিয়া মনের আগুনে আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে! তাহার গৃহে স্বর্গীয় বিমল সুধা অযত্নে অনাদরে গড়াগড়ি যাইতেছে, আর সে বিষ-পানের আশায় উন্মত্ত হইয়া প্রাণের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছে!

কমলাপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া লীলা একেবারে শয্যা-গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উত্থানশক্তি আর নাই বলিলেই হয়। দুঃখে, মর্ম্মবেদনায়, হতাশতায়, তাহার হৃদয় একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লীলার এই অবস্থা দেখিয়া অবিনাশবাবু বড়ই ব্যথিত। বাস্তবিকই, তিনি লীলাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাহার জন্য তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণকে লীলার চিকিৎসার্থ নিযুক্ত করিলেন, বটে, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না! এমন কি রোগ-নির্ণয়ে কেহই সমর্থ হইলেন না। শেষে সকলেই এক-মতাবলম্বী হইয়া নানাপ্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। হায়! মনের বিকার ঔষধে কি উপশমিত হইবে? কাজেই, লীলার পীড়ার কোনও উপশম হইল না। আর সে ঔষধ সেবনও করিত না। তাহার বাসনা, যদি সুধীরের সহিত তাহার মিলনই না হইল, তবে যেরূপে হউক, দেহ হইতে জীবনটা বহির্গত হইয়া যাউক্।

বিখ্যাত বিখ্যাত ঔষধালয় হইতে দ্বিগুণ মূল্য দিয়া লীলার জন্য যে-সব ঔষধ আসিত, লীলা তাহা আদৌ খাইত না। ঔষধগুলি বাতায়নপথ দিয়া কার্ণিসে, রাজপথে, অথবা পিকদানীতে স্থান পাইত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, 'খাইয়াছি।' কেহ যদি ঔষধ খাওয়াইতে আসিত, লীলা তাহাতে বড় বিরক্ত হইত; বলিত, "থাক্, আমি নিজেই খাব এখন।"

চিকিৎসকগণ যখন লীলার পীড়ার কিছু উপশম হইতে দেখিলেন না, তখন সকলে এক-মত হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

চিকিৎসকগণ যখন লীলার চিকিৎসা ছাড়িয়া "চেঞ্জের" ব্যবস্থা করিলেন, তখন অবিনাশবাবু লীলার জীবনসম্বন্ধে একেবারে হতাশ হইলেন। যাহা হউক্, "যা করেন ভগবান্" এই বলিয়া তিনি বায়ুপরিবর্ত্তনে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন হইল যামিনীবাবু সপরিবারে দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে গিয়াছেন। অবিনাশবাবু লীলাকে লইয়া সেইখানেই যাইতে মনস্থ করিলেন। কারণ, লীলা তাহার কাকাকে বড় ভালবাসে। কাকার সঙ্গে বেড়াইতে, কাকার কাছে গল্প করিতে লীলার বড় আনন্দ হয়। লীলার যাহাতে মন ভাল থাকে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। তাই অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর কাছে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে অবিনাশবাবু লীলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন। কাকা সেখানে আছেন জানিয়া লীলা যাইতে কোনও আপত্তি করিল না। কাকাকে আর একবার জন্মশোধ দেখিতে, কাকার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে, তাহার বড় সাধ হইয়াছিল।

যামিনীবাবু অগ্রজের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা-হেতু পুত্রকন্যা-সহ, রেলষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছিলেন। ট্রেন আসিয়া পৌঁছিলে লীলা দেখিতে পাইল, তাহার কাকা কতকগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া 'প্ল্যাটফর্ম্মে'র উপর দাঁড়াইয়া আছেন। অবিনাশবাবু লীলার হাতখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে ট্রেন হইতে অবতরণ করিতেছেন দেখিয়া, যামিনী বাবু তাঁহার নিকটে আসিলেন। লীলাকে দেখিয়া প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। ইহার পূর্ব্বে তিনি লীলাকে যেরূপ দেখিয়াছিলেন লীলা তদপেক্ষা বহু শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"লীলা! এ কি হয়ে গেছিস্ মা!" বলিয়া তিনি সস্নেহে লীলার হাতখানি ধরিলেন। সে স্নেহ-সম্ভাষণে লীলার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সে কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। তাহার আর্দ্র চক্ষুর্দ্বয়ই এ কথার উত্তর প্রদান করিল। অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্ষমতাও লীলার ছিল না। ধীরে ধীরে তাহার মস্তকটী হেলিয়া যামিনীবাবুর স্কন্ধের উপর পড়িল।

নিকটেই যান প্রস্তুত ছিল। যামিনীবাবু সযত্নে লীলাকে ধরিয়া শকটে উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার কন্যা লতিকা তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিল। যামিনীবাবুর বাসা অধিক দূর নহে। সকলে কথা-বার্ত্তা করিতে করিতে যামিনীবাবুর বাসার দিকে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে লতিকা লীলাকে কত কথা বলিতে লাগিল; নানা স্থানে দার্জ্জিলিং-য়ের দৃশ্যাবলি-সকল দেখাইতে লাগিল। লতিকা লীলারই সমবয়স্কা। লীলাকে পাইয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

গৃহে উপস্থিত হইলে যামিনীবাবুর পত্নী অতিযত্নে অতিথিদ্বয়কে গ্রহণ করিলেন। অবিনাশবাবু যামিনীবাবুর বাটীতে আর কখনও আসেন নাই। এই তাঁহার প্রথম আগমন। যামিনীবাবুর স্ত্রীর রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, যত্ন ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কোথায় তাঁহার গর্ব্বিতা পত্নী! আর কোথায় এই শিক্ষিতা ভ্রাতৃবধূ! উভয়ের চরিত্রের যতই তিনি মনে মনে তুলনা করিতে লাগিলেন, ততই তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে লাগিলেন! বস্তুতঃ, গৃহিণীর গুণেই যামিনীবাবুর সংসারে যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

গৃহিণী লীলাকে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। আর লতিকার ত কথাই নাই। সে লীলাকে পাইয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে, ভাবিল। সে একদণ্ডও লীলার কাছ ছাড়া হইত না; সর্ব্বদাই লীলার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত; কখন বা লীলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া লীলার পার্শ্বে লীলার শয্যায় শুইয়া পড়িত; কত কথা, কত গল্প বলিত! তাহার সেই সরলতামাখা সুমিষ্ট কথাগুলি বাস্তবিকই লীলার প্রাণে তৃপ্তিদান করিত। লতিকার স্বামী সুহৃদ্‌ও আসিয়া মাঝে মাঝে তাহাদের গল্পে যোগদান করিত।

লীলার উঠিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা ছিল

না। শয্যায় শুইয়া-বাতায়নপথ দিয়া সে দার্জ্জিলিংয়ের আকাশচুম্বি-শিখরমালা ও মেঘের বিচিত্র খেলা একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। কখনও বা মেঘের কণারাশি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া কক্ষতল সিক্ত করিয়া দিত। লীলা তাহা দেখিয়া হাসিত। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার সে আর কখনও দেখে নাই। পাহাড় হইতে নানাপ্রকার রঞ্জিত বৃক্ষপত্রসকল চয়ন করিয়া সুহৃদ্ লীলাকে আনিয়া দিত। লীলা সেই সকল অপূর্ব্ব বস্তুর বৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত!

লীলার মনস্তুষ্টির জন্য সকলেই প্রয়াসী ছিল। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া সে অনেকটা শান্তিলাভ করিয়া-ছিল বটে, কিন্তু বাঁচিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না। সে দিবানিশি প্রার্থনা করিত, "ঐ মেঘের তলায়, ঐ পর্ব্বতের উপরে আমার এই ব্যর্থ দেহ ভস্মীভূত হউক্; এই শান্তিময় স্থানে আমি যেন চিরনিদ্রায় মগ্ন থাকি! আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হউক্। হে ঠাকুর! আমায় তোমার চরণতলে স্থান দাও! আর যেন আমাকে সংসারে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিও না।" কিন্তু ঠাকুর তাহার সে প্রার্থনা শুনিলেন না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুশীলা মিত্র।

গান।

(ইমন কল্যাণ)

বসন্ত ঐ জাগ্‌লো মনে
　　　　তোমা তরে,
ফাল্গুন-হাওয়া ব’লো বনে
　　　　তোমা তরে!
　মন-কোকিল উঠ্‌লো ডাকি
　মুখরিয়া কুঞ্জ-শাখী,
　গোলাপ-কমল উঠ্‌লো জাগি
　　　　তোমা তরে!

মন-ভ্রমরা　গুঞ্জরিল,
সকল তরু　মুঞ্জরিল,
গোপন সুধা সঞ্চারিল
　　　　তোমা তরে!
উঠলো ফুটি তারার পাঁতি,
নাম্‌লো প্রেমের গহন রাতি,
দিকে দিকে জ্বল্‌লো বাতি
　　　　তোমা তরে!!

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এ।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আত্মা সাক্ষী বিভুঃ পূর্ণ একো মুক্তশ্চিদক্রিয়ঃ।
অসঙ্গো নিস্পৃহঃ শান্তো ভ্রমাৎ সংসারবানিব ॥১১॥

দেহাদিতে আত্মভ্রম হয় বলিয়া আত্মা সংসারী বলিয়া প্রতীত হ'ন; কিন্তু বস্তুতঃ আত্মা কেবল দেহ-মন-প্রভৃতির দ্রষ্টা, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ, একরূপ, স্বভাবতঃ মুক্ত, চৈতন্যমাত্র, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, নিঃস্পৃহ ও শান্ত।১১।

কূটস্থং বোধমদ্বৈতমাত্মানং পরিভাবয়।
আভাসোঽহং ভ্রমং মুক্ত্বা বাহ্যভাবমথান্তরম্ ॥১২॥

যাহাকে 'আমি' বলিয়া মনে কর সেই 'আমি' ভ্রম। "এই দেহাদি আমার" এই বাহ্যভাব ও "আমি সুখী বা দুঃখী" ইত্যাদি অন্তঃকরণের ভাব বর্জন করিয়া নির্ব্বিকার একরূপ বোধমাত্রকে আত্মা বলিয়া জান।১২।

দেহাভিমানপাশেন চিরং বদ্ধোঽসি পুত্রক।
বোধোঽহং জ্ঞানখড়্গেন তং নিকৃত্য সুখী ভব ॥১৩॥

হে বৎস, তুমি চিরকাল দেহাত্মবোধরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছ। "আমি (দেহাদি নহি) বোধ মাত্র" এই জ্ঞানরূপ খড়্গের দ্বারা সেই পাশ ছেদনপূর্ব্বক সুখী হও।১৩।

নিঃসঙ্গো নিষ্ক্রিয়োঽসি ত্বং স্বপ্রকাশো নিরঞ্জনঃ।
অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি ॥১৪॥

তুমি স্বভাবতঃ নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশ এবং নির্ম্মল। ইহাই তোমার বন্ধন যে, তুমি যোগানুষ্ঠান করিতেছ।১৪।

ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং ত্বয়ি প্রোতং যথার্থতঃ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপস্ত্বং মাগমঃ ক্ষুদ্রচিত্ততাম্ ॥১৫॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত; ইহা বাস্তবিকই তোমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে। তুমি স্বরূপতঃ নির্ম্মল এবং জ্ঞানময়; অতএব ক্ষুদ্রচিত্ত হইও না।১৫।

নিরপেক্ষো নির্ব্বিকারো নির্ভরঃ শীতলাশয়ঃ।
অগাধবুদ্ধিরক্ষুব্ধো ভব চিন্মাত্রবাসনঃ ॥১৬॥

তুমি ভোজনাদি-নিরপেক্ষ, জন্মাদিবিকাররহিত, দেহাদিভারশূন্য, শান্তস্বরূপ, অগাধবুদ্ধি, অবিদ্যাদিক্ষোভশূন্য। অতএব কেবল বোধমাত্রে অবস্থিত হও।১৬।

সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারং তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ ॥১৭॥

সাকার শরীরাদিকে মিথ্যাভূত বলিয়া জান (অতএব বিষয়-সকল বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে); এবং নিরাকার আত্মতত্ত্বকেই একমাত্র স্থিরবস্তু বলিয়া জান। এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইলে এবং তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্বে অবস্থান ঘটিলে, পুনরায় সংসারে আসিতে হয় না।১৭।

যথৈবাদর্শমধ্যস্থে রূপেঽন্তঃ পরিতস্তু সঃ।
তথৈবাস্মিন্ শরীরেঽন্তঃ পরিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৮॥

দর্পণে প্রতিবিম্বিত শরীরের ভিতরে, বাহিরে চারিদিকে যেমন দর্পণই বিদ্যমান, সেইরূপ অস্মদাদির শরীরের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে পরমেশ্বর রহিয়াছেন।১৮।

একং সর্ব্বগতং ব্যোম বহিরন্তর্যথা ঘটে।
নিত্যং নিরন্তরং ব্রহ্ম সর্ব্বভূতগণে তথা ॥১৯॥

যেরূপ ঘটের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে

এক সর্ব্বব্যাপী আকাশ বর্ত্তমান, সেইরূপ সকল জীবের ভিতরে বাহিরে চারিদিকে নিত্য অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন।১৯।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আত্মানুভব-নামক
প্রথম প্রকরণ।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

ইত্থং গুরূক্তিপীযূষাস্বাদাদনুভবমাত্মনঃ।
আবিশ্চকার সাশ্চর্য্যং শিষ্যো নিজগুরুং প্রতি॥১

এইরূপ গুরুবাক্যামৃত আস্বাদন করিয়া শিষ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় গুরুর উদ্দেশ্যে নিজের অনুভব বর্ণনা করিলেন।১।

অহো নিরঞ্জনঃ শান্তো বোধোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
এতাবন্তং মহাকালং মোহেনৈব বিড়ম্বিতঃ॥১॥

অহো, আমি সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বপ্রকার বিকারের অতীত; আমি প্রকৃতির অতীত, স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র। আমি এই সুদীর্ঘকাল মোহবশতঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বারা) বিড়ম্বিত হইতেছি।১।

যথা প্রকাশয়াম্যেকো দেহমেনং তথা জগৎ।
অতো মম জগৎ সর্ব্বম্ অথবা চ ন কিঞ্চন॥২॥

যেরূপ এই দেহকে আমি প্রকাশিত করিতেছি, সেইরূপ সমস্তজগৎকেও প্রকাশিত করিতেছি। অতএব (যদি দেহ আমার, তবে) সমস্ত জগৎই আমার, অথবা কিছুই আমার নহে (কেন না আমি স্বপ্রকাশ-চৈতন্যমাত্র; দেহও আমার নহে, জগৎও আমার নহে।)।২।

সশরীরমিদং বিশ্বং পরিত্যজ্য ময়াধুনা।
কুতশ্চিৎ কৌশলাদেব পরমাত্মা বিলোক্যতে॥৩॥

দেহ-সহিত সমস্ত বিশ্বকে আত্মা হইতে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া আমি এখন গুরূপদিষ্ট কৌশলক্রমে পরমাত্মাকে অবলোকন করিতেছি।৩।

যথা ন তোয়তো ভিন্নাস্তরঙ্গাঃ ফেনবুদ্বুদাঃ।
আত্মনো ন তথা ভিন্নং বিশ্বমাত্মবিনির্গতম্॥৪॥

তরঙ্গ, ফেন এবং বুদ্বুদ যেরূপ জল হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ আত্মোপাদানে বিনির্ম্মিত বিশ্বও আত্মা হইতে ভিন্ন নহে।৪।

তন্তুমাত্রো ভবেদেব পটো যদ্বদ্বিচারিতঃ।
আত্মতন্মাত্রমেবেদং তদ্বদ্বিশ্বং বিচারিতম্॥৫॥

যদি সূক্ষ্মভাবে বিচার করা যায়, তবে বস্ত্র যেরূপ সূত্রমাত্রই হয়, সেইরূপ যদি সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করা যায়, তবে জগৎও আত্মা বলিয়াই বিবেচিত হইবে।৫।

যথৈবেক্ষুরসে ক্লৃপ্তা তেন ব্যাপ্তৈব শর্করা।
তথা বিশ্বং ময়ি ক্লৃপ্তং ময়াব্যাপ্তং নিরন্তরম্॥৬॥

যেরূপ ইক্ষুরসে অবস্থিত শর্করা তাহার দ্বারাই ব্যাপ্ত, সেইরূপ আমাতে অবস্থিত (অধ্যস্ত) বিশ্বও আমার দ্বারাই অবিচ্ছেদে ব্যাপ্ত।৬।

আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্নভাসতে।
রজ্জ্বজ্ঞানাদহির্ভাতি তজ্জ্ঞানাদ্ভাসতে নহি॥৭॥

আত্মার জ্ঞান না থাকিলে জগৎ প্রতিভাত হয়; আত্মজ্ঞান হইলে আর জগৎ প্রতিভাত হয় না। রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান না হইলে, তাহাকে সর্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু রজ্জুর যথার্থ জ্ঞান হইলে সর্প আর প্রতিভাত হয় না।৭।

প্রকাশো মে নিজং রূপং নাতিরিক্তোঽস্ম্যহং ততঃ।
যদা প্রকাশতে বিশ্বং তদাহংভাস এব হি॥৮॥

নিত্যবোধই আমার আপন স্বরূপ; আমি নিত্যবোধমাত্র হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহি। জগৎ যে প্রকাশিত হয়, তাহা আমার চৈতন্য

হইতেই ; (অন্যথা আত্মচৈতন্য না থাকিলে জগৎও থাকিত না) ।৮।

অহো বিকল্পিতং বিশ্বমজ্ঞানান্ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ ফণী রজ্জৌ বারি সূর্য্যকরে যথা ॥৯॥

অহো, এই জগৎ অজ্ঞানবশতঃ আমার নিকট প্রতিভাত হয়! যেমন (অজ্ঞানবশতঃ) শুক্তিতে রৌপ্য-ভ্রম, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অথবা সূর্য্যকিরণে (মরীচিকায়) জল-ভ্রম হয় ।৯।

মত্তো বিকল্পিতং বিশ্বং মষ্যেব লয়মেষ্যতি।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃ কনকে কটকং যথা ॥১০॥

এই জগৎ আমা হইতেই বিকল্পিত (উৎপন্ন) এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হইবে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন কলস মৃত্তিকাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, যেমন জল হইতে উৎপন্ন তরঙ্গ জলেই বিলীন হয় অথবা যেমন স্বর্ণ হইতে বিনির্ম্মিত বলয় স্বর্ণেই লয় পায় ।১০।

অহো অহং নমো মহ্যং বিনাশো যস্য নাস্তি মে।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগন্নাশেঽপি তিষ্ঠতঃ ॥১১॥

অহো! আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যেহেতু আব্রহ্মস্তম্ব জগৎ বিনষ্ট হইলেও আমার নাশ নাই ।১১।

অহো অহং নমো মহ্যমেকোঽহং দেহবানপি।
ক্বচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্যবিশ্বমবস্থিতঃ ॥১২॥

অহো! আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যেহেতু (নানাবিধ সুখ-দুঃখাশ্রয়) দেহধারণ করিলেও আমি একই। আমি কোথায়ও যাইও না, আসিও না ; সকল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি। ১২।

অহো অহং নমো মহ্যং দক্ষো নাস্তীহ মৎসমঃ।
অসংস্পৃশ্য শরীরেণ যেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্ ॥১৩॥

অহো আমার মহিমা! আমাকেই নমস্কার! যে-হেতু আমার ন্যায় দক্ষতা আর কাহারও নাই ; আমি স্পর্শ না করিয়া চিরকাল এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

অহো অহং নমো মহ্যং যস্য মে নাস্তি কিঞ্চন।
অথবা যস্য মে সর্বং যদ্ বাঙ্মনসগোচরম্ ॥১৪॥

অহো আমার মহিমা, আমাকেই নমস্কার! যে-হেতু আমার কিছুই নাই, অথবা যাহা কিছু বাক্যমনের গোচর, তাহা সমস্তই আমার। (যেহেতু আমি আছি বলিয়াই সমস্ত আছে, আমি না থাকিলে কিছুই থাকে না)।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং নাস্তি বাস্তবম্
অজ্ঞানাদ্ভাতি যত্রেদং সোঽহমস্মি নিরঞ্জনঃ ॥১৫।

জ্ঞান, জ্ঞেয়বস্তু এবং পরিজ্ঞাতা এই ত্রিতয় বাস্তবিকপক্ষে নাই। এ-সকল অজ্ঞান-বশতঃ যে আমাতে প্রকাশিত হয়, সেই আমি নিরঞ্জন (সর্ব্বপ্রকার মলিনতাশূন্য) পুরুষ। ১৫।

দ্বৈতমূলমহো দুঃখং নান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্বমেকোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ ॥১৬

অহো! সকল দুঃখের মূল আমাদের দ্বৈত-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি! বাস্তবিক পক্ষে এই পরিদৃশ্য-মান জগৎ সমস্তই মিথ্যাভূত, আমি অদ্বিতীয় নির্মল চৈতন্যমাত্র—এই জ্ঞান ব্যতিরেকে দ্বৈতভ্রান্তিজন্যদুঃখনিবারণের আর কোনও ঔষধ নাই। ১৬।

বোধমাত্রোঽহমজ্ঞানাদুপাধিঃ কল্পিতো ময়া।
এবং বিমৃশতো নিত্যং নির্বিকল্পে স্থিতির্মম ॥১৭॥

আমি বোধমাত্র (চিদেকস্বরূপ)। আমিই অজ্ঞানবশতঃ বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন প্রভৃতি উপাধির কল্পনা করিয়াছি (তদ্দ্বারাই জগৎ

প্রতিভাত হয়)। এই সত্য নিত্য বিচার করিলে দ্বৈতভ্রান্তি বিদূরিত হইবে ও চিৎ-স্বরূপে অবস্থান ঘটিবে।১৭।

অহো ময়ি স্থিতং বিশ্বং বস্তুতো ন ময়ি স্থিতম্।
ন মে বন্ধোঽস্তি মোক্ষো বা ভ্রান্তিঃ শান্তা
নিরাশ্রয়া ॥ ১৮ ॥

অহো! এই জগৎ আমাতেই অবস্থিত (অধ্যস্ত)। বাস্তবিক পক্ষে অবার ইহা আমাতে নাই (কেন না আমি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র)। আমার বন্ধন নাই (অতএব) মোক্ষও নাই। ভ্রান্তি নিরাশ্রয় হইয়া নষ্ট হইল। (এতদিন উহা আমাতে ছিল, কিন্তু তত্ত্ববিচারের দ্বারা আমার জ্ঞান জন্মিলে, উহা আর কোথায় থাকিবে?)। ১৮।

সশরীরমিদং বিশ্বং ন কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতম্।
শুদ্ধচিন্মাত্র আত্মা চ তৎ কস্মিন্ কল্পনাধুনা
॥ ১৯ ॥

আমার শরীরাদি সমস্ত জগৎ কিছুই নহে—ইহা স্থির করিয়াছি; আমিও বিশুদ্ধচৈতন্য-মাত্র; তবে এখন দ্বৈতভ্রান্তিরূপ কল্পনা কোথায় থাকিবে? (১৯)।

শরীরং স্বর্গনরকৌ বন্ধমোক্ষৌ ভয়ং তথা।
কল্পনামাত্রমেবৈতৎ কিং মে কার্য্যং চিদাত্মনঃ
॥ ২০ ॥

শরীর, স্বর্গ, নরক, সংসারবন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি এবং অনিষ্টের ভয় এ সমস্তই কল্পনামাত্র। চিৎস্বরূপ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। (অবিদ্যাবশতঃ যাঁহারা দ্বৈত স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই বিধিনিষেধ মানিতে হয়; কেন না তাঁহাদের অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। যাহার পক্ষে অন্য নাই, তাহার কর্ত্তব্য কোথায়? নিজের প্রতি কর্ত্তব্যও নাই; কেন না, নিজে নির্বিকার চৈতন্যমাত্র)।

অহো জনসমূহেঽপি ন দ্বৈতং পশ্যতো মম।
অরণ্যমিব সংবৃত্তং ক রতিং করবাণ্যহম্ ॥২১॥

অহো! অদ্বৈতদর্শী আমার নিকট এই জনসমূহের মধ্যেও যেন সমস্ত অরণ্যপ্রায় হইয়াছে! (মিথ্যাভূতবস্তু-সমূহের মধ্যে) কোথায় প্রীতিবন্ধন করিব? (২১)

নাহং দেহো ন মে দেহো জীবো নাহমহং হি
চিৎ।
অয়মেব হি মে বন্ধ আসীদ্যজ্জীবিতে স্পৃহা
॥২২॥

আমি দেহ নই, আমারও দেহ নহে, আমি জীব নই, আমি কেবল চৈতন্য। ইহাই আমার বন্ধন যে, আমার জীবনে স্পৃহা ছিল। ২২।

অহো ভুবনকল্লোলৈর্বিচিত্রৈর্দ্রাক্ সমুত্থিতম্।
ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে সমুদ্যতে ॥ ২৩ ॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব। ইহাতে চিত্তরূপ বায়ু যেমন বহিতে লাগিল, অমনি নানাবিধ বিচিত্র-ভুবনরূপ তরঙ্গসকল প্রকাশ পাইল। ২৩।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ চিত্তবাতে প্রশাম্যতি।
অভাগ্যাজ্জীববণিজো জগৎপোতো বিনশ্বরঃ
॥ ২৪ ॥

মদ্রূপ চৈতন্যমহার্ণবে যদি চিত্তবায়ু প্রশান্ত হয়, তবে ভাগ্যহীন জীববণিকের জগৎরূপ নৌকা (অচল হইয়া) বিনাশ পায়। ২৪।

ময্যনন্তমহাম্ভোধাবাশ্চর্য্যং জীববীচয়ঃ।
উদ্যন্তি ঘ্নন্তি খেলন্তি প্রবিশন্তি স্বভাবতঃ ॥২৫॥

আমি চৈতন্যমহার্ণব; ইহাতে জীবরূপ তরঙ্গসকল উত্থিত হইতেছে, পরস্পর আঘাত করিতেছে, খেলা করিতেছে ও বিলীন হইতেছে।—ইহাই জীবরূপ তরঙ্গের স্বভাব। ২৫।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার শিষ্যোল্লাস-নামক দ্বিতীয় প্রকরণ।　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

'ঈশ্বর কি আছে ভাব ?' নাস্তিকেতে কয়,
পদে পদে যাঁর সবে পায় পরিচয় !
আকাশ অবনী যাঁরে করিছে বিকাশ,
নাস্তিকের কাছে তিনি হন্ অপ্রকাশ !
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ তারা-সমুদয়,
একতানে মহেশের নাম সদা কয় !
নদ নদী রত্নাকর উন্নত ভূধর,
ফুল-ফল-তরুরাজি প্রকৃতি সুন্দর,
পশু পক্ষী কীট যত পতঙ্গ-নিচয়,
কেহই তাঁহার গানে বিরত ত' নয় !
নরের প্রত্যেক কার্য্যে যাঁর অধিষ্ঠান,
কি করে তাঁহার সত্তা মোরা করি আন ?
খাই পরি চলি বলি যাঁহার কৃপায়,
কি করে কৃতঘ্ন হয়ে ভুলিব তাঁহায় ?

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

নবীনালোক।

মরণে লুকায়েছিল কি মহামঙ্গল !
জাগিল কুহেলি ভেদি সবিতা উজ্জ্বল !
অন্ধ এ হৃদয়াকাশে ঘুচিল তমসা,
ম্লানতম মৃত প্রাণ লভিল ভরসা ;
খুলিল নয়নে এক নবীন আলোক,
হেরিনু তাহার মাঝে অজর অশোক
দিব্যধাম পুরী এক মনোহর অতি ;
করি তুমি আমি তাহে আনন্দে বসতি !

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

হিন্দুর তীর্থ-নিচয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেওঘর (দেবঘর)—

ইহা সাঁওতাল-পরগণার 'হেড কোয়াটার'। এখানকার জন-সংখ্যা ৮৮৩৮। স্থানটীতে ২২টী শিবমন্দির আছে। তীর্থ করিবার জন্য ভারতের প্রায় সকল স্থান হইতেই এখানে লোক সমাগত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দিরটী বৈদ্যনাথ বা বাইজ্‌নাথ-নামে খ্যাত। ভারতে যে সকল বহুপুরাতন শিবলিঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইহাও একটী। মন্দির-গুলি উচ্চপ্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে বিস্তীর্ণ অঙ্গন। মির্জ্জাপুরের জনৈক সমৃদ্ধ সওদাগর লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মন্দিরগুলি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তিনটী মন্দির ব্যতীত অবশিষ্ট সকল মন্দিরেই শিবমূর্ত্তি আছে। উক্ত তিনটী মন্দিরে পার্ব্বতীর মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শিব-মন্দিরের শিখর-দেশ হইতে পার্ব্বতীর মন্দিরের চূড়া পর্য্যন্ত একগাছি রেশমের দড়ি সম্বদ্ধ আছে। এই দড়িটী ৪০ বা ৫০ গজ লম্বা। দড়িতে রঙ্গিন কাপড়, ফুলের মালা, ইত্যাদি বিলম্বিত থাকে।

শিবকে হিন্দুরা পরমব্রহ্ম বলিয়া মানিয়া থাকেন। সর্ব্বশাস্ত্রেই ইনি মহাকাল-নামে ব্যাখ্যাত। তিনি অপক্ষয়, বিনাশাদিরহিত কালাত্মার অবস্থাদিশূন্য, অথচ সর্ব্বাবস্থ। কালের কোন আকার নাই, অথচ তিনি সাম্বাকার-বিশিষ্ট। কালের কোন রূপ নাই, অথচ তিনি সর্ব্বরূপবান্। কালই জগদুৎপাদক, জগৎপালক ও জগৎ-সংহারক। সর্জ্জন, পালন, নিধন—এইগুলি কালের একপ্রকার অবস্থা। অপর অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, ইহাও তদবস্থারূপে পরিগণিত হয়। বাল্য যৌবন, জরা—জীব-সম্বন্ধে এই তিন অবস্থাকেও কালাবস্থা বলা যায়। অনাম, অরূপ হইয়াও কাল সর্ব্বনাম ও সর্ব্বরূপ-বিশিষ্ট। শ্রুতি বলেন, কাল স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরমাণু ও স্থূলাতিস্থূল কল্পাদি; (অর্থাৎ কল্প হইতে সূক্ষ্মমন্বন্তর, মন্বন্তর হইতে দিব্যযুগ, যুগ হইতে বৎসর, বৎসর হইতে অয়ন, অয়ন হইতে ঋতু, ঋতু হইতে মাস, মাস হইতে পক্ষ, পক্ষ হইতে দিবা, দিবা হইতে প্রহর, প্রহর হইতে যামার্দ্ধ, যামার্দ্ধ হইতে মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্ত হইতে দণ্ড, দণ্ড হইতে পল, পল হইতে বিপল, বিপল হইতে অনুপল, অনুপল হইতে কলা, কলা হইতে বিকলা, বিকলা হইতে কাষ্ঠা, কাষ্ঠা হইতে নিমেষ, নিমেষ হইতে ক্ষণ, ক্ষণ হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে অণু, অণু হইতে পরমাণু ইত্যাদি।) এইরূপে স্থূল-সূক্ষ্ম-রূপে কালের অনেক অবয়ব। কাল যে ভূত-ভবিষ্যম্-বর্ত্তমান-ত্রিকালদর্শী, একারণ শিব ত্রিলোচন-বিশিষ্ট। সংসার জরাবস্থায় নিধন-দশা প্রাপ্ত হয় বলিয়া শিবস্বরূপে বৃদ্ধাবস্থা বর্ণিত হইয়া থাকে। কালের প্রলয়াগ্নিতাপে জগৎ ভস্মীভূত হয়; তন্নিদর্শনার্থ শিব ভস্মভূষণ। কালে জীবনিকায়ের কঙ্কালমালাতে জগৎ পরিপূর্ণ হয়, এজন্য অনাদিনিধন শিব কঙ্কালমালী। কালে নরসকলের অস্থি ভূতলে বিচরিত হয়; এ-কারণ শিবরূপের কণ্ঠকমলে নরকপাল সংস্থিত। মুক্তিকালে জীব-সকলে পরমাত্মা কালরূপে শয়ন করেন, আর পুনর্ব্বার জাগ্রৎ হন্ না, এ-কারণ শিবকে মহাশ্মশানালয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। তদ্ভিন্ন শ্মশানভূমিতে মহাদেবের বাসের আরও কারণ এই যে, কালরূপী শঙ্কর সর্ব্বসংহারক। আর মুণ্ডমালা-ধারণের এই কারণ যে, কালে সকল জীবেরই শির নিরস্ত হয়। এতন্নিদর্শনার্থ হরগলে নরশিরোমালা বিভূষণ। নীলকণ্ঠরূপে কালের কালিমার প্রদর্শন করা হইয়াছে। কালের অপরিচ্ছিন্নতায় সর্ব্বব্যাপকত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ শিব দিগ্বাসা হইয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টির যত অঙ্গ ও যত উপকরণ আছে, সে সকল অঙ্গের মধ্যে প্রধানাঙ্গ পঞ্চ মহাভূত। এ-কারণ কালস্বরূপ শিবরূপের পঞ্চাননত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কালের অমোঘবীর্য্যতা পদে পদে প্রদর্শিত হয়, তাহাকে উত্তমাধম-মধ্যম পক্ষে নিয়তি কালের প্রধানা শক্তি। সেই নিয়তিই শিবের ত্রিশূল। তাহা কোনমতেই ব্যর্থ হয় না; অর্থাৎ নিয়তির অন্যথা করিতে কেহই পারেন না। যিনি যত বড় দুরাত্মা ও হিংস্র হউক না কেন, কালে তাহার নিধন হয়। তাহার চর্ম্মোপরি কাল নিয়তই অবস্থান করেন। এই-হেতু শিব ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর। ভুজঙ্গকুলও কালের বশীভূত; এ-কারণ শিব সদা ভুজঙ্গভূষণ। জ্ঞানস্বরূপ

মহাকাল শিবরূপ; তাঁহার বাহন বৃষ। এতদর্থে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান কেবল এক ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। অতএব বৃষরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞানস্বরূপ শিবকে সর্ব্বদা বহন করেন; অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানের সম্যক্ ফললাভ হয়। কোন কোন মতে শিবকে চতুর্ভুজ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। তাহাতে চতুর্ব্বর্গই সাক্ষাৎ প্রমাণ হইতেছে। যথা—"পরশুমৃগবরাভীতিহস্তমিত্যাদি"। যে হস্তে মৃগ, সেই হস্তই কাম, অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ-পূরক মৃগমুদ্রা। যে হস্তে কুঠার, সেই হস্তই অর্থ; অর্থাৎ বিনা শত্রুনাশে রাজ্য কি ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে পারে না। যে-হস্তে বর, সেই হস্তই ধর্ম্ম। অর্থাৎ বিনা ধর্ম্মে বিশুদ্ধ সুখের সন্দর্শন হয় না। যে হস্তে অভয়, সেই হস্তই মোক্ষ। অর্থাৎ বিনা মোক্ষে জীবের ভয়-শান্তি হয় না। অতএব কালমূর্ত্তি যে পরমাত্মা শিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ শিবকে দশবাহুরূপেও ধ্যান করেন! তদর্থে কালের কর দশদিকেই বিস্তৃত আছে। দশবিধ অস্ত্র-ধারণের অর্থ, আত্মা হইতে কালে জীবের নানোপকরণ দ্বারা মৃত্যু হইয়া থাকে। যিনি কাল, তিনিই জগৎকর্ত্তা, ভর্ত্তা ও হর্ত্তা। সুতরাং, যিনি কর্ত্তা তিনিই ঈশ্বর। এ-কারণ শিবকে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলেন।

বৈদ্যনাথের মন্দির-সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ইহা ত্রেতাযুগ হইতে বিদ্যমান আছে। শিবপুরাণ বলেন যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ বহু-ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার বাটীতে মহাদেব না থাকিলে তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তিই অপূর্ণ রহিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি কৈলাসে গমন করতঃ মহাদেবকে তাঁহার বাটীতে চিরতরে বাস করিবার জন্য প্রার্থনা করেন! মহাদেব তাহাতে কিন্তু সম্মত হইলেন না। রাবণ অনেক অনুনয়-বিনয় করিলে তিনি তাঁহাকে একটী জ্যোতির্লিঙ্গ প্রদান করিয়া বলিলেন যে, ইহার স্থাপনায় যে ফল তাঁহার স্বয়ং থাকিলেও সেই ফল। সুতরাং, তিনি সেই লিঙ্গ লইয়া রাবণকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ দিলেন এবং ইহাও তাহাকে বলিয়া দিলেন, যেন লিঙ্গটী কোনরূপে ভাঙ্গিয়া না যায় অথবা তাহাকে স্বীয় বাটী ভিন্ন অন্যত্র রাখিয়া দেওয়া না হয়। কারণ, তাহা হইলে তাহা তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। রাবণ হৃষ্টচিত্তে লিঙ্গটী লইয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবতারা ভাবিলেন যে, শত্রুগৃহে জ্যোতির্লিঙ্গ-স্থাপনা দেবতাদিগের পক্ষে কল্যাণকর হইবে না। সুতরাং, যাহাতে সেটী না হইতে পায় তদ্বিষয়ে একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়া বরুণদেবকে রাবণের উদরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। বরুণ তাহাই করিলেন। বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে রাবণ প্রস্রাবের পীড়ায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি প্রস্রাব করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। এমন সময় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ পরিগ্রহ করিয়া রাবণের সহিত বার্ত্তালাপ আরম্ভ করিলেন। রাবণ দেবতাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকে শিবলিঙ্গটী ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মণও সম্মত হইলেন। তাঁহার হস্তে শিবলিঙ্গটী প্রদান করিয়া রাবণ প্রস্রাব করিতে গমন করিলেন কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও জ্যোতির্লিঙ্গটীকে আর দেখিতে পাইলেন না। অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি দেখিলেন যে, যে-স্থানে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার বহুদূরে লিঙ্গটী স্থাপিত রহিয়াছে। লিঙ্গটী উঠাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া বলপ্রয়োগ করিলে লিঙ্গের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গেল। রাবণ তখন প্রণত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত প্রত্যহ হিমালয় হইতে গঙ্গোদক লইয়া আসিয়া লিঙ্গের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। জলের জন্য প্রত্যহ হিমালয়ে গমন করা অসু-বিধাজনক ভাবিয়া রাবণ লিঙ্গের সন্নি-কটে একটী কূপ খনন করিয়া তাহা সকল তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিলেন। রাবণ যে-স্থানে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছিলেন তাহার নাম "হরলাজুরী"। দেওঘর হইতে ইহা চারিমাইল দূরে অবস্থিত। যে স্থানে লিঙ্গটী স্থাপিত হয়, তাহার নাম দেওঘর (দেব ঘর)। লিঙ্গটী বৈদ্যনাথ-নামে খ্যাত।

পদ্মপুরাণের মতে রাবণ ব্রাহ্মণের হস্তে শিবলিঙ্গটী অর্পণ করিলে ব্রাহ্মণ বিধি-অনুসারে কূপোদক-দ্বারা তাহার পূজা করিয়া প্রস্থান করিলেন। অর্চ্চনাকালে তথায় একজন ভীল উপস্থিত ছিল। দেবতার পূজা কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ভীলকে কহিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হ'ন। রাবণ ফিরিয়া আসিলে ভীল সমস্ত ঘটনা রাবণকে বলে এবং সে ইহাও বলে যে, ব্রাহ্মণ আর অন্ত কেহ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। রাবণ তখন বাণদ্বারা একটি কূপ খনন করিয়া পূজার জন্ত সর্ব্বতীর্থের জল-দ্বারা তাহা পূর্ণ করেন।

অন্যান্ত পুরাণের মতে বৈদ্যনাথের সত্তা সত্যযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। সতী দক্ষ-যজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব তাঁহাকে ত্রিশূলোপরি লইয়া উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন চক্রদ্বারা সতীদেহ ৫২ খণ্ডে খণ্ডিত করেন। সতীর যে যে খণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা এক একটী পীঠস্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বৈদ্যনাথে সতীর হৃৎপিণ্ড পতিত হয়। অন্ত আখ্যায়িকা এই যে, সত্যযুগে মহাদেব জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে দ্বাদশটী স্থানে আবির্ভূত হন্। তন্মধ্যে বৈদ্য-নাথ একটী। সতী এই লিঙ্গ পূজা করিয়া-ছিলেন। তিনি কেতকীপুষ্পরূপ পরিগ্রহ করিয়া শিবের উপর বাস করিতেন, এরূপ প্রবাদও শুনা যায়। এইজন্য বৈদ্যনাথের আর একটী নাম কেতকীবন।

বৈদ্যনাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সরকারী রাস্তা ও দক্ষিণে নহবতখানা। অঙ্গনের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের সন্নিকটে একটি ফটক আছে। ইহার উপর বনাইলির রাজা পদ্মানন্দ একটী ঘর তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ফটকই মন্দির-প্রবেশের প্রধান দ্বার। অঙ্গনের উত্তর প্রান্তে সদর পাণ্ডার বাটী। যে গৃহে লিঙ্গটী অবস্থিত তাহা ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। গৃহাভ্য-ন্তরে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ কেহ কিছুই দেখিতে পায় না। দুইটী ঘৃতপ্রদীপ লিঙ্গের সম্মুখে জ্বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারটী চাঁদনীযুক্ত। সন্নিকটে একটী ষণ্ড-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছাদের ভিতর হইতে একটী ঘণ্টা দোদুল্যমান

রহিয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে তীর্থযাত্রিগণ ঘণ্টাটী বাজাইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এখন এই কার্য্যটী প্যাণ্ডাই করিয়া থাকে। বৈদ্যনাথের মন্দিরের অঙ্গনে অপর ১১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহাদিগের নাম:— (১) বৈদ্যনাথ, (২) লক্ষ্মী-নারায়ণ, (৩) সাবিত্রী (তারা), (৪) পার্ব্বতী, (৫) কালী, (৬) গণেশ, (৭) সূর্য্য, (৮) সরস্বতী, (৯) রামচন্দ্র, (১০) বগলাদেবী, (১১) অন্নপূর্ণা এবং (১২) অম্বদা-ভৈরব।

উল্লিখিত মন্দির ব্যতীত ক্ষুধনাথের মন্দিরও এখানে দেখা যায়। শৈলজানন্দ ওঝা-নামক জনৈক ব্যক্তি একটি রৌপ্য-নির্ম্মিত পঞ্চমুখী লিঙ্গ দান করেন। মনসাদেবীরও একটী মন্দির এখানে আছে। এতদ্ব্যতীত তিনটী বৌদ্ধমূর্ত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তিত্রয় হিন্দুদেবতারূপে পূজিত। তন্মধ্যে লোকনাথটী কার্ত্তিকেয়রূপে, অন্যটী সূর্য্যরূপে ও বুদ্ধমূর্ত্তিটী কালভৈরবরূপে পূজিত হইতেছে।

মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখে একটী কূপ আছে। ইহা চন্দ্রকূপ-নামে খ্যাত। রাবণ ইহাকেই সমস্ত তীর্থের জলের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মন্দিরের অঙ্গনের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি 'মনুমেণ্ট' আছে। ইহা একটি পাকা ধাপের উপর অবস্থিত। ধাপটী উচ্চতায় ছয় ফিট এবং চতুষ্কোণের পরিসরটী ২০ ফিট। ধাপের উপর তিনটী বৃহৎ স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। স্তম্ভগুলিতে কুম্ভীরের মূর্ত্তি খোদিত। বোধ হয়, পূর্ব্বে দোলযাত্রার সময় শ্রীকৃষ্ণদেবকে এখানে দোল খাওয়ান হইত। কর্ম্মনাশার জল অপবিত্র। প্রবাদ এই যে, রাবণের প্রস্রাবই কর্ম্মনাশা নদীরূপে পরিণত হইয়াছে।

পূজার উপকরণ জল, পুষ্প, চন্দন এবং আতপতণ্ডুল। পূজা সমাপনান্তে দেবতাকে টাকা বা স্বর্ণ সাধ্যানুসারে চড়াইতে হয়। তাম্র দেবতার সংস্পর্শে আইসে না। ধনাঢ্য ব্যক্তি-গণ, গাভী, ঘোড়া, পাল্কি, স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি দেবতার ভেট্ দিয়া থাকেন। যদি কেহ কোন বস্তু পরে দান করিতে চাহে, তবে সেই বস্তুর নাম বিল্বপত্রে লিখিয়া সন্ধ্যা-কালে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই লেখাই তীর্থকামী ব্যক্তির পক্ষে যথেষ্ট। একবার বিল্বপত্রে লেখা হইলে কেহ দেব-তাকে প্রতারণা করে না। শিব বিল্বপত্র, জল, চন্দন এবং পুষ্পেই সন্তুষ্ট হ'ন্। তবে বিল্বপত্রগুলি ত্রিকূট- (তিউর) পর্ব্বতের হওয়া চাই। জল-সম্বন্ধে রাবণ-খনিত-কূপো-দকই যথেষ্ট; তবে বদরিনাথ বা মানস-সরো-বরের জল সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

রোগিগণ রোগমুক্ত হইবার জন্য এখানে হত্যা দেয়। তাহারা প্রত্যূষে শিবগঙ্গা-পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া শিবলিঙ্গের পূজা করতঃ বারান্দায় শয়ন করে। পরদিন প্রভাতে তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া মুখপূর্ণ-জলমাত্র পান করিয়া পুনরায় শয়ন করে। এইরূপে তিন চারি দিন হত্যা দিলে তাহারা স্বপ্নে বৈদ্যনাথের আদেশ পায়। সেই আদেশমত কার্য্য করিলে রোগমুক্তি হইয়া থাকে। যাহাদিগের রোগ অসাধ্য তাহা-দিগকে স্বপ্নে বলা হয় যে, "তুমি রোগমুক্ত হইবে না" ইত্যাদি।

সংস্কৃত পুস্তকে বৈদ্যনাথের অনেক নাম

আছে ;—যথা, হারদাপীঠ, রাবণবন, কেতকী-বন হরিতকীবন এবং বৈদ্যনাথ। বঙ্গদেশে স্থানটী বৈদ্যনাথ নামেই খ্যাত।

(পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম)

পোনাবালিয়া।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামস্থিত বাকরগঞ্জের সাব-ডিভিসনের ইহা একটি গ্রামমাত্র। এখানকার লোকসংখ্যা ৪৭৮। এখানকার জমিদার রামভদ্র রায় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য-দলকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। এখানে একটি শিবমন্দির আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে সতীর নাসিকা পতিত হয়। সুতরাং, ইহাও একটি পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত।

ঢাকা-দক্ষিণ

আসামের সিলেট (শ্রীহট্ট) জেলার একটী গ্রাম মাত্র। বৈষ্ণবদিগের ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে চৈতন্য-মহাপ্রভু বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মন্দিরে অনেক যাত্রীই প্রতিবৎসর সমাগত হয়। পঞ্চখণ্ডে সুপাতাল-নামক স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। স্থানটী খুবই প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২২)

অবাধ্য ছেলের গোঁয়ার্ত্তমী-জেদ সংশোধনের জন্য স্নেহময়ী মাতা যেমন নিষ্ঠুর-কঠোর হইয়া উঠেন, নিজের অধীর উত্তেজনাদৃপ্ত মনটা শাসন করিবার জন্য নমিতাও তেমনই রূঢ়-কঠিন হইতে চেষ্টা করিল। সে নিজেকে তিরস্কার করিয়া বুঝাইল, "কে কোথায় কি বলিতেছে না-বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য অত উৎকর্ণ হইয়া থাকিলে, সংসারের সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া সর্ব্বত্যাগী সাজিতে হইবে! কিন্তু সে বৈরাগ্য-গ্রহণ যখন আপাততঃ আদৌ সম্ভবপর নহে, তখন সাধারণ সংসারী মানুষের মত শান্ত-সংযত হইয়া নিজের ন্যায্য কর্ত্তব্যটা পালন করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ।" দুঃখিযত্ন অপমান-গ্লানি, অসহ্য দৈন্যলাঞ্ছনা, সব মাথায় থাক; চোখের জল চোখে শুকাইয়া যাক, মনের ব্যথা মনে মরিয়া যাক্! হে ভগবন্, তোমার প্রসন্ন হাসিটুকু অন্তরে উজ্জ্বল-দীপ্ত থাকুক, ইহাই প্রার্থনা; মানুষের হাসিখুসি কাণাকাণির কোলাহলের ঊর্দ্ধে, তোমার সান্ত্বনা-অভয়বাণী ঝঙ্কৃত হইতেছে! তাহা যেন স্থির কর্ণে অহরহঃ শুনিতে পায়। সমস্ত সুখ-দুঃখের ভার তোমার পায়ে ঢালিয়া দিয়া, সে যেন তোমার কার্য্যসাধনের জন্যই আপনাকে লঘু করিয়া লইতে পারে! ইহাই আশীর্ব্বাদ কর।

রাত্রে আহারাদির পর সুশীলকে লইয়া বিছানায় আসিয়া নমিতা নিস্তব্ধতার অবকাশে বিরুদ্ধ সংশয়-দ্বন্দ্বের সহিত যুঝিয়া সুশীল ঘুমাইবার অনেক পরে অস্বস্তি-পূর্ণচিত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে সে শুনিল, কে বাহির

হইতে ডাকিতেছে—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" কণ্ঠস্বরটা যেন সুরসুন্দরের বোধ হইল। চট্ করিয়া মাথা হইতে নিদ্রাঘোর ছুটিয়া গেল, স্পষ্টরূপে জাগিয়া নমিতার মনে হইল সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। কারণ, আজ রাত্রের গাড়ীতে, এতক্ষণ সুরসুন্দর ত দেশে চলিয়া গিয়াছে! তবে এ ডাকে কে? অন্য কেউ?

আবার ডাক শুনিতে পাওয়া গেল,—"বিমলবাবু, বিমলবাবু!" এবার সন্দেহ নয়; —নিঃসংশয় সত্য, সুরসুন্দরই বটে! সহসা নমিতার আপাদমস্তক কেমন একটা ভয়-জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে বুকের কাছে হাঁটু গুটাইয়া প্রাণপণে গুটিসুটি মারিয়া নিঝুম হইয়া পড়িয়া রহিল। সে নিজে সাড়া দিতে পারিল না, বা পার্শ্বের ঘরে গিয়া নিদ্রিত বিমলকে জাগাইতেও সাহস করিল না। আজ চারিদিক্ হইতে খোঁচা খাইয়া, তাহার মনটা নিজের অসঙ্কোচ-নির্ভীকতার উপর তীব্র বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে! ......সরল বিশ্বাসে, প্রশান্ত নির্ম্মল দৃষ্টি তুলিয়া, বড় উচ্চ আশায় জগতের সহিত অকপট সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে সে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ যে এমন উগ্র-বিকট-দুর্গন্ধময় কর্দ্দমের ঝাপ্‌টা চোখে মুখে লাগিয়া তাহার শান্তিস্বাচ্ছন্দ্য বিধ্বস্ত করিয়া দিবে, তাহা ত তাহার জানা ছিল না! কিন্তু, যখন সে জানিয়াছে, তখন আর দুঃসাহস প্রকাশ করা নয়!

উপর্য্যুপরি ডাক শুনিয়া বিমলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া রাস্তার ধারের জানালা খুলিয়া সাড়া দিল। সুরসুন্দর বলিল, "আমি তেওয়ারী কম্পাউণ্ডার। মিস্ স্মিথের কাছ থেকে আস্‌ছি। দিদিকে উঠিয়ে দেন; একটা 'কল' আছে; যেতে হবে।"

একটা শঙ্কিত আগ্রহ নমিতার বুকের মধ্যে চমকিয়া উঠিল। "কল!"—এতরাত্রে 'কল'!......নিশ্চয়ই খুব গুরুতর প্রয়োজন! সে নিঃশব্দে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, বিমল জিজ্ঞাসা করিতেছে, "এখনই যেতে হবে? রাত্রি ১টা যে বাজে!"

উত্তরে আর এক ব্যক্তি ব্যগ্রভাবে বলিল, "ম'শাই, ডবল ফি দেওয়া হবে। আমাদের বড় বিপদ্। 'কলেরা কেস' তার ওপর অসময়ে আটমাসে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, একটি নার্সের বড় দরকার। মিসেস্ দত্তকে আন্‌তে গেছ্‌লুম; পাই নি। তাই আপনাদের এখানে আস্‌ছি। যেতেই হবে। আজ রাত্রিটা সেখানে থাকৃতে হবে। যা চা'ন দেব।"

"কলেরা কেস্"—"অসময়ে প্রসব হয়ে প্রসূতি মুমূর্ষু"—"নার্সের বড় দরকার" ......কথা কয়টা যেন, বজ্রঝঞ্ঝনায় আঘাত জাগাইয়া, ক্ষিপ্র-আলোড়নে নমিতার মস্তিষ্ক বিচলিত করিয়া তুলিল! নিস্তেজ মনের সমস্ত আলস্য-জড়তা, মুহূর্ত্তে যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার্ হইয়া গেল; কোন দ্বিধা-সঙ্কোচের সমস্যা লইয়া হিসাব মীমাংসার সময় রহিল না। 'প্রয়োজন!......বড় প্রয়োজন!'...... তাহার দাবী সকলের ঊর্দ্ধে!

পাছে সুশীলের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সাবধানে খাটের উপর হইতে নামিয়া পড়িয়া, নমিতা অন্ধকারে হাতড়াইয়া, আন্‌লার দিকে অগ্রসর হইল। অনুমানে জামা-কাপড়গুলা

টানিয়া নামাইয়া, যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত সে তাহা পরিতে লাগিল। বিমল আলো হাতে করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া ডাকিল, "দিদি!"

সন্ত্রস্ত হইয়া নমিতা বলিল, "চুপ!—সুশীল উঠে পড়বে। আমি শুনেছি সব; জামা কাপড় পরছি।-তুমি চট্ করে যাও, লছ্মীর মাকে উঠিয়ে দাও। চেঁচিও না; মা'র ঘুম ভেঙ্গে যাবে।"

বিমল গিয়া লছ্মীর মাকে উঠাইয়া দিল। লছ্মীর মা প্রস্তুত হইয়া আসিল। বেশী রাত্রে, বা দূরতর স্থানে ডা'কে যাইতে হইলে লছ্মীর মা নমিতার সঙ্গে যাইত। তবে মিসেস্ স্মিথ্ সঙ্গে থাকিলে নমিতা কাহাকেও লইত না।

কার্ত্তিক মাস, নূতন শীত পড়িতেছে। নমিতা বিমলের গরম মলিদার চাদরখানা চাহিয়া লইল। এতরাত্রে ট্রাঙ্ক খুলিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় বাহির করিবার সময় নাই। লছ্মীর মা কম্বল জড়াইয়া ঠিক্ হইয়া আসিয়াছিল। যথাসম্ভব সত্বর তাহারা বাহিরে আসিল। বিমল আলো লইয়া সঙ্গে আসিল।

বাহিরে রাস্তায় সুরসুন্দর ও আর একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। লোকটী দেখিবামাত্র খাস-বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তিনি সুরসুন্দরেরই সমবয়স্ক। মূর্ত্তিটি বেশ সৌম্য-সম্ভ্রান্ততা-পরিচায়ক। তাঁহার মুখে চোখে উদ্বেগ-বিবর্ণতার চিহ্ন ফুটিয়া রহিয়াছে।

বিমল সুরসুন্দরকে বলিল, "আপ্নার বাড়ী যাওয়া হোল না বুঝি?"

সুরসুন্দর বলিল "না, রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় স্মিথের সঙ্গে এঁদের ওখানে গেছ্লুম; এখন ফিরে এসে আবার ঔষধ-পত্র নিয়ে যাচ্ছি।" (নমিতার প্রতি) "মিস্ মিত্র, আপনার হাতে ব্যাণ্ডেজটা আছে ত?"

নমিতা বলিল, "আছে।"

সুরসুন্দর বলিল, "হাতে ঘা আছে বলে স্মিথ্ আপত্তি করছিলেন, কিন্তু মিসেস্ দত্তকে যখন পেলুম না—"

বাধা দিয়া নমিতা বলিল, "আমার ব্যাণ্ডেজ ত' খুব ভাল রকমেই বাঁধা আছে। একটু সাবধানে কাজ করব। তা হলেই হবে। চলুন, কতদূরে যেতে হবে?"

সু। গঙ্গার ও-পারে, লালবাজারে —সাম্‌নে ঘাটে নৌকা আছে।

"বেশ চলুন"। এই বলিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া নমিতা বলিল, "সুশীল একলা আছে, তুমি তার বিছানায় শোওগে যাও। মাকে বোলো যেন না ভাবেন্। বাড়ীর দুয়ার বন্ধ করে যাও।"

তাহারা শীঘ্র গঙ্গার ঘাটে আসিয়া নৌকায় উঠিল। নৌকা খুলিয়া দিল। চারিজন দাঁড়ি প্রাণপন-বলে দাঁড় বহিতে লাগিল। গঙ্গার উপর খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছিল। সকলে 'ছই'এর মধ্যে আশ্রয় লইল। লছ্মীর মা সুরসুন্দরের সহিত আলাপ জুড়িল। অপরিচিত 'বাবুটির' পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল যে, তিনি এখানকার বাসিন্দা নহেন;—ভাগিনেয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া আজ এখানে আসিয়াছেন; সঙ্গে মাতাও আসিয়াছেন। ভাগিনেয়টি মারা গিয়াছে। এখন ভগিনী পীড়াক্রান্তা!—একে সদ্যঃ পুত্রশোক, তাহাতে সাঙ্ঘাতিক-ব্যাধি!

তাহার উপর অসময়ে প্রসব!—রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

নমিতা শুনিল ভদ্রলোকটির নাম চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চন্দ্রবাবু সমস্ত পথ একটিও কথা কহিলেন না; বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে নৌকা আসিয়া ও-পারে ভিড়িল। সকলে নামিয়া দ্রুতপদে চলিলেন।

কিছু দূরে আসিয়া, বাড়ী দেখিতে পাওয়া গেল। বৈঠকখানায় আলো জ্বলিতেছিল। দুই তিন জনের কথার সাড়াও পাওয়া গেল। তাহারা আসিয়া সেখানে উঠিলেন।

ঘরের দুয়ার জানালা সব বন্ধ; তামাকের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘরখানা ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। দুইজন হিন্দুস্থানী ভৃত্যশ্রেণীর লোক সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে। তাহাদের একজন এক কোণে, মেঝের উপর পড়িয়া আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে; অন্য ব্যক্তি নিদ্রালস-চক্ষে বসিয়া বসিয়া 'তামাকুল' ভরিয়া কলিকা সাজাইতেছে। ঘরের মেঝেময় টিকা, তামাক, ছাই-গুল ছত্রাকারে ছড়ান রহিয়াছে। এখানে যে অবিশ্রাম তামাক পুড়িতেছে, সেগুলি যেন তাহারই জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য!

ঘরের মাঝখানে তক্তাপোষের উপর ময়লা সতরঞ্চি ও ততোধিক ময়লা তাকিয়া লইয়া দুইজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া আছেন। একজন শীর্ণাকৃতি, ফর্শা-রং, প্রৌঢ়;—অপর ব্যক্তি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সুবিশাল, গাট্টা-গোট্টা বলিষ্ঠ চেহারার যুবা। তাঁহার রং আধ্‌ময়লা, দাড়ি-গোঁফ কামানো, মুখের গঠনে সুন্দর শ্রীছাঁদ, কিন্তু অস্বাভাবিক আত্মম্ভরিতার গর্ব্ব যেন সেখানে নিষ্ঠুর-কর্কশ ভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।—দেখিলেই মনে হয়, লোকটি দানে-ধ্যানে, সকলতাতেই সমান সিদ্ধহস্ত।—তাঁহার গায়ে উৎকৃষ্ট সিল্কের কোট ও তাহার উপর জরির হাঁসিয়াদার মূল্যবান্ শাল। কিন্তু দুইটাই অত্যন্ত ময়লা-ধরা। মাথায় সযত্নে কোঁকড়ান চুলে চক্‌চকে-মাজা টেড়ি!—যেন যত কিছু সৌখীনতা ও পরিচ্ছন্নতা মগজ ফুঁড়িয়া চুলের উপর ঢেউ খেলাইতেছে! প্রৌঢ় লোকটির বেশভূষা সাধারণ, তবে তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া খুব সতর্ক-চতুর স্বভাবের লোক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তিনি বসিয়া গুড়গুড়ির নল টানিতেছেন, আর মাঝে মাঝে থামিয়া খুব দ্রুত স্বরে তড়্‌বড়্ করিয়া বকিতেছেন।

সুরসুন্দর প্রভৃতি ঘরে ঢুকিতেই তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "কি হোল, কি হোল? ওষুধ্ পেলে? যন্তর?—বহুৎ আচ্ছা! নার্শের কি হোল? মিসেস্ দত্ত এলেন্ না বুঝি?—"

সুরসুন্দর বলিল, "তাকে পাই নি। আর একজন এসেছেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 656. April, 1918.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৫ বর্ষ। ৬৫৬ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২৪। এপ্রিল, ১৯১৮। | ১১শ কল্প। ২য় ভাগ।

গান।

(পূরবী—তেওরা)

কেমনে র'ব একেলা—
দিবস-যামিনী কেটে যায় কত
বিজন ঘরে নিরালা!
শুকায়ে যায় প্রাণ, লুকায়ে যায় গান,
নিভিয়া যায় দীপ, থামিয়া যায় তান,
ফুরায়ে আসে ফুল, ঝুরায়ে হু'নয়ান
নিভৃতে কাটে দু'বেলা!
একা বসে আছি তিমিরে—
কেহ নাহি মোর সন্নাতে এ ঘোর
বিজন মানস-কুটীরে!
তোমারে আজিকে ডাকিতেছি প্রাণে,
আলোকে পুলকে এসো প্রেমে গানে
ভরিয়া জীবন প্রসূনে কুসুমে
গাঁথ নবীন জীবন-মালা॥

শ্রীনিখিলচন্দ্র বড়াল।

নমিতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"কই কই ;"—এই বলিয়া তিনি ব্যগ্র-ভাবে দ্বারের দিকে চাহিলেন ; তারপর বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া খরনয়নে নমিতাকে দেখিতে লাগিলেন। টেড়িওয়ালা বাবুটিও চকিত-নয়নে সে-দিকে একবার চাহিলেন ; তারপর একটু কাশিয়া, নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণপরে মুখ হইতে সিগার নামাইয়া তিনি ছাই ঝাড়িয়া, ডানদিক্ হইতে তাকিয়াটা টানিয়া বাঁ-দিকে সরাইলেন ও তা'র উপর হেলিয়া বসিয়া খুব গম্ভীরভাবে একমনে সিগার টানিতে টানিতে আড়-চোখে দুয়ারের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, এখন অবস্থা কেমন ?"

প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিলেন, "ভাল,—কিছু ভাল। আমার সঙ্গে মেমের মতের মিল হয়েছে। আমি যা বল্লুম, মেম্ সেই ওষুধ্ই দিলেন। পনের মিনিট ঘুম হয়েছিল। মেম বল্লেন, 'কিছু সুরাহা।'—নয় হে গৌর ?"—

'গৌর'-নামধেয় শ্যামবর্ণ বাবুটি বলিলেন, "হুঁ, আমরা এই কতক্ষণ সেখান থেকে আসছি।" তক্তপোষের কোণে ঠুকিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে প্রবল মুরুব্বি-আনার ভঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিহাসের হাসি হাসিয়া গৌরবাবু পুনশ্চ বলিলেন, "তারপর বড়কুটুম্ চন্দরবাবু, সতীশও এবার চম্পট্ দিলে !"—

"বড়কুটুম" চন্দ্রবাবু উক্ত সুরসাল সম্ভাষণে কিছুমাত্র স্নিগ্ধ হইতে পারিলেন না ; উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "সতীশ চলে গেল ! বাড়ী ছেড়ে চলে গেল ? কোথায় গেল ?"—

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রৌঢ় বাবুটি তড়্‌বড়্ করিয়া বলিলেন, "ও ছোক্‌রার শরীরে আক্কেলগন্ধ কিছুই নাই। আরে বাবু ! বাড়ীতে রোগ, পালাপালি কর্‌লে চল্‌বে কেন ? এই যে আমরা—আমরা রইছি না ? হুঁ, কে বলে বল ? মুরুব্বি হলে নানা দোষ ! বড় ভাইটা অমনি, বাড়ীতে এমন বিপদ্, চেয়ে দেখ্‌লে না ; ছেলে-পরিবার নিয়ে চোঁ-চা চম্পট্ দিলে শ্বশুর-বাড়ীতে ! এইটে কি যতীশের উচিত কাজ হোল—!"

বুক চিতাইয়া ঊর্দ্ধমুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া, গম্ভীরভাবে গৌরবাবু বলিলেন, "আরে যতীশটা গাধা, গাধা।"

চন্দ্রবাবু অধিকতর ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "সতীশ গেল কোথা ম'শাই ?—"

প্রৌঢ়বাবুটি সে-কথা শুনিতে পাইলেন না ; তড়্‌বড়্ করিয়া নিজের কথাই কহিতে লাগিলেন,—"তবে বল্‌বে, তোমরা কর্‌ছ কেন ? কি করি ? পরের উব্‌কার ! আমায় কেউ 'সময়ে' মানুক্, না মানুক্—অসময়ে কিন্তুন্, এই মিএগই বুক দিয়ে পড়ে সবার ভাল করে ! লছমন্ ভকত, গণেশবাবু, এরা বলেন আলবাত্তারে মানুষের সেরা মানুষ হচ্ছে, মহেশ-ডাক্তার !—কি হে গৌর বল ?—"

গৌর কিছু বলিবার আগেই চন্দ্রবাবু

অধীর হইয়া বলিলেন, "গৌরবাবু, বলুন্ ম'শায়, সতীশ কি আর আস্‌বে না, বখে গেছে ?—"

গৌরবাবু অধিকতর মুরুব্বি-আনার সহিত হাসি-হাসি-মুখে পরম মনোযোগসহকারে সিগারেটে দুইটা বড় বড় টান দিয়া, হ্যাঃ-হ্যাঃ করিয়া আধা-হাসির আধাকাশির অভিনয় করিয়া ধুম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "আস্‌বে না কেন ?—তবে এখন কি না, শ্রীঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত !—এখন উপাসনা, ওর নাম কি নিদ্রা চলুক। শয়নে পদ্মলাভ আর কি ?—" বলিতে বলিতে ডানপায়ের হাঁটু উঁচু করিয়া, তাহার উপর বাঁ পা উঠাইয়া, আড়ভাবে রাখিয়া, সুকৌশলে লীলাভঙ্গি-সহকারে মৃদু মৃদু পা নাচাইতে নাচাইতে খুব একটা গূঢ়ার্থ-ব্যঞ্জক সরস হাসি হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার এই অসাময়িক রসিকতা নমিতার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইল ; কিন্তু কি বলিবে, —এই অপরিচিত ভদ্রসন্তানকে ? কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রবাবুও যেন থতমত খাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন ! সুরসুন্দর বিরক্ত ভাবে বলিল, "ম'শাই মাপ্ করুন্, রোগীর প্রাণসঙ্কট অবস্থা !—সোজা কথায় বলুন, শ্রীঘর কি ?"

তাকিয়া ছাড়িয়া, তীরবেগে সোজা হইয়া বসিয়া গৌরবাবু হঠাৎ অতিশয় উদ্ধত ভাবে তর্জ্জন করিয়া মোটা গলায় বলিলেন, "তুমি কে হে বাপু ! তুমি থাম ; এখানে চালাকি কর্‌তে এস না। বুড়ো মোল্লারে কয়দা শেখাতে এসেছ ? বাঃ ! ভারী তো হে কম্পাওণ্ডার তুমি !"

সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্ ! অকস্মাৎ এ প্রচণ্ড গর্জ্জনের কারণ কি ?—অবাক্ হইয়া সুরসুন্দর ও চন্দ্রবাবু পরস্পর মুখ-চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলেন। নমিতার কান-দুইটা গরম আগুন হইয়া উঠিল ! পরিচ্ছদের মূল্য-মহার্ঘতায় যে, মানুষ ভদ্রলোক হইতে পারে না,—ইচ্ছা হইল, সেটুকু সবিনয়ে উক্ত শাল-ওলা বাবুকে বুঝাইয়া দেয় ! কষ্টে আত্মদমন করিয়া চন্দ্রবাবুকে সে বলিল, "ম'শাই রুগীর ঘর দেখিয়ে দিন্ ;—আমাদের কাজ সেখানে।"

চন্দ্রবাবুর চমক ভাঙ্গিল ; বলিলেন—"এই যে আসুন—।"

তাঁহারা অগ্রসর হইয়া যখন দ্বারের কাছে আসিয়া পৌছিয়াছেন, তখন কি ভাবিয়া কে জানে, প্রৌঢ় মহেশবাবু বলিলেন, 'সতীশ আড়ৎ-ঘরে গেছে। বাড়ীতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাই এখানে রইল না ; সেইখানে ঘুমুচ্ছে।'

"উত্তম"—বলিয়া চন্দ্রনাথবাবু ঘর পার হইয়া গেলেন। অন্য সকলে নিঃশব্দে তাঁহার পিছু চলিল।

নানাজাতীয় জঞ্জালে ভর্ত্তি একটা প্রকাণ্ড সান-বাঁধা উঠান পার হইয়া একটা দালান পাওয়া গেল। দালানেও গৃহস্থালীর বিস্তর রকম তৈজসপত্র ছড়ান ছিল। সে দালান পার হইয়া আর একটা স্যাঁৎসেঁতে ভাব্‌সা-গন্ধ-ধরা ঘর পাওয়া গেল ; সে ঘরের ভিতর দিয়া গিয়া, আর একটি ছোট দালান পার হইয়া, তাহারা রোগীর ঘরে ঢুকিল।

ঘরে ছত্রাকারে নানাদ্রব্য ছড়ান, পা বাড়াইবার স্থান নাই। একপাশে কতগুলা

ময়লা তেল-চিটা দুর্গন্ধে ভরপুর বালিশ ও বিছানা স্তূপাকার করা রহিয়াছে। খাটের উপর সামান্য বিছানা ও অয়েল ক্লথের উপর একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের ক্ষীণকায়া যুবতীর অচৈতন্য দেহ পড়িয়া আছে। স্নিগ্ধ নিকটে বসিয়া নাড়ী দেখিতেছেন, আর একটি বর্ষীয়সী বিধবা,—বোধ হয় চন্দ্রবাবুর মাতা,—একপাশে বসিয়া চক্ষের জল মুছিতেছেন! ঘরের একপাশে ষ্টোভে আগুন জ্বালিয়া, একটি সদ্যঃপ্রসূত ক্ষুদ্র শিশুকে একজন হিন্দুস্থানী দাই সেঁক দিতেছে।

ইহারা ঘরে ঢুকিতেই, স্নিগ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "নমি এলে!—তেওয়ারী, তুমি সব জিনিস পেয়েছ? আচ্ছা, ওষুধটা চট্‌ করে তৈরী কর। শোন শোন, কিছু খেয়ে এসেছ বাবা?—"

কুণ্ঠিত বিনয়ের হাসি হাসিয়া সুরসুন্দর মৃদুস্বরে বলিল, "চাকর'রা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল;—ওঠাতে গেলে দেরী হবে বলে—"

ভর্ৎসনার স্বরে স্নিগ্ধ বলিলেন, "নির্ব্বোধ! সব জিনিস তৈরী ছিল, বলে দিই নি? আমার বাড়ী!—তুমি ত' সেখানকার জামাই নও বাবা? যাও, এখন ক্ষুধা পরিপাক কর!—এমন অবাধ্য!"

সুরসুন্দর ঔষধ প্রস্তুতের অছিলায় তাড়াতাড়ি বাহিরে পলায়ন করিল। নমিতার দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ বলিলেন, "হাতটা পুড়িয়ে দেব না কি? এস ত দেখি ব্যাণ্ডেজটা।"

নমিতা হাত দেখাইল। স্নিগ্ধ ব্যাণ্ডেজটা ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন; তারপর বলিলেন, "আচ্ছা চল্‌বে;—কাজ কর। কিন্তু তোমায় অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করাই আজ আমার উচিত নয় কি?—ভারী দুঃসাহস!......এই যে বুড়ী দাইজী সঙ্গে আছ;—ভালই। মা নিশ্চিন্ত থাক্‌বে! যাও লছমীর মা, পাশের ঘরে সতরঞ্চি বিছান আছে; ঘুমাও গিয়ে।"

দু-একটা কথার পর, লছমীর মা চলিয়া গেল। স্নিগ্ধ চন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়, মিসেস্ দত্ত কি বলে ফিরিয়ে দিলেন?—"

চন্দ্রবাবু বলিলেন, "তার সঙ্গে দেখা হয় নি। বাসার চাকর বল্লে, তিনি ডাক্তার মিত্রবাবুর সঙ্গে 'কলে' বেরিয়েছেন, আজ ফিরিবেন না।"—

স্নিগ্ধ একটু সংশয়ের স্বরে বলিলেন, "কলে বেরিয়েছেন? ফির্‌বেন না?"

সঙ্গে সঙ্গে উৎকট বিস্ময়ের সহিত নমিতার মনের মধ্যেও একটা তীক্ষ্ণ সংশয় সজোরে বহিয়া গেল। কিন্তু এখন কোন কথা কহিবার সময় নাই বলিয়া, সে চুপ করিয়া রহিল। নমিতা স্নিগ্ধের ইঙ্গিত মত কাজ আরম্ভ করিল। সুরসুন্দর নূতন ঔষধ তৈয়ারী করিতে পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল। হাঁসপাতাল হইতে ঔষধপত্র সব আনা হইয়াছিল, এখন আবার নূতন ঔষধ আনা হইল।

সুরসুন্দর ঔষধের 'গ্লাশ' লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত গৌরবাবু ও মহেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহেশবাবু দ্বারের সম্মুখে আড় হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ওষুধ্‌ দিচ্ছ হে?"

গ্লাশের উপর হাত চাপা দিয়া সুরসুন্দর বলিল, "অনুগ্রহ করে একটু সরুন, আগে ওষুধটা খাইয়ে দিই; ঝাঁজ উড়ে যাচ্ছে!"

ভাল করিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া মহেশবাবু একটু জিদের সহিত বলিলেন, "আহা, বলেই যাও না বাপু!"

এবার সুরসুন্দর চটিল। রুক্ষস্বরে বলিল, "ভাল গ্রহ ত! ম'শাই, আমি সে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নই। ও-ঘরে 'প্রেসক্রপসান' পড়ে আছে, খুসি হয় গিয়ে দেখুন।"

সহসা রুখিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধত-কর্কশ ভাবে রূঢ় চীৎকারে গৌরবাবু হাঁকিলেন,—"ইউ আর ভেরি ব্যাড্, ফুল! তুমি জান, উনি একজন মেডিকেল 'প্র্যাক্‌টিসানার!"

গৌরবাবু অকস্মাৎ এত জোরে চীৎকার করিয়াছেন যে, গৃহস্থ সকলেই চমকিয়া উঠিয়াছিল;—এমন কি মহেশবাবু পর্য্যন্ত! তিনি ভয়ে থতমত খাইয়া, পথ ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "যাও, যাও, যাও।"

সুরসুন্দর দীপ্তনেত্রে মুহূর্ত্তের জন্য গৌরবাবুর দিকে চাহিল; তারপর আত্মসংবরণ করিয়া নম্রভাবে বলিল, "ম'শাই, রোগীর ঘর দাঙ্গার জায়গা নয়; গুণ্ডামী করতে হয়, বাইরে যান্।"

সুরসুন্দর অগ্রসর হইয়া রোগীর কাছে আসিল। নমিতা ক্ষিপ্রহস্তে চামচে করিয়া চাড় দিয়া রোগীর মুখ খুলিলে, সুরসুন্দর মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিয়া, নাক টিপিয়া ধরিতেই সংজ্ঞাহীন রোগী ঢোক গিলিয়া ঔষধ গলাধঃকরণ করিল।

সুরসুন্দর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে বলিল, "ম'শাই, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার সম্মানে আঘাত করতে আমি চাই না।—তবে এটুকু বলে রাখ্‌ছি, মনে রাগ বেন—পয়সার গরমে মানুষ ভদ্রলোক হতে পারে না। ভদ্রতার পরিচয় ব্যবহারেই প্রকাশ পায়!"

মহেশবাবুর দিকে চাহিয়া গৌরবাবু বলিলেন, "শুনুন্ শুনুন্, তেজের কথা শুনুন্।"—সুরসুন্দরের দিকে কট্‌মট্ চক্ষে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি জান, গলাধাক্কা দিয়ে তোমায় এ বাড়ী থেকে দূর করে দেবার ক্ষমতা আমার আছে?"

স্মিথ্ এতক্ষণ চুপচাপ্ বসিয়া সব দেখিতেছিলেন; এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কখনই না।—এ-বাড়ীর ওপর তোমার কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা থাক্‌তে পারে; কিন্তু এই ঘরে,—রোগীর ঘরে শান্তিরক্ষার জন্য সকল রকম ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার আমার আছে! বেশী বাড়াবাড়ি কোর না; আমি পুলীশের সাহায্য নিতে বাধ্য হব; রোগীর প্রাণের জন্যে তোমায় দায়ী কর্‌ব।—যাও, সসম্মানে বলছি—স্থান-ত্যাগ কর।"

গৌরবাবু মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর অপমানের কোন প্রতীকার উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, নিষ্ফল আক্রোশে হাতদুইটা উর্দ্ধে ছুড়িয়া দাঁত কড়মড় করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা দেখ্‌ব!—প্রমথ-ডাক্তার আমার হাতে আছে!—" তিনি সশব্দ পদাঘাতে দালান কাঁপাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মহেশবাবু ভয়বিহ্বলস্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ, কি সর্ব্বনাশ! কেঁচো খুড়্‌তে সাপ! বাবা! গৌর! ও কি সহজ ছেলে! ওকে চটান, ও বাবা!"

মিস্ স্মিথ্ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গী ঐ অদ্ভুত মেজাজের কর্ত্তৃত্বপ্রিয় নবাবটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি ?"

মহেশবাবুর তড়্‌বড়ে কথাবার্ত্তা সব জড়াইয়া গেল। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া শুষ্ককণ্ঠে থামিয়া থামিয়া তিনি বলিলেন, "ও গণেশবাবু, এখানকার প্রধান গোলাদার মহাজনের ছেলে! ও কি সাধারণ লোক! ও ইচ্ছে করলে এখনই পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল্ এখানে হাজির করতে পারে! সতীশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তাই এ বাড়ীতে এসে বসে আছে; নইলে, ওর পায়া ধরে কে? ও মনে করলে, পঞ্চাশ কি? পাঁচশো লাঠিয়াল্ এনে হাজির করতেও পারে......।"

গল্পবাজ ভদ্রলোকটির অনুমানের বহর ও গল্পের দৌড় ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, স্মিথ্ সকৌতুকে হাসিয়া বলিলেন, "তবেই ত সাঙ্ঘাতিক। এবার থেকে দেখ্‌ছি দুশো-পাঁচশো শরীররক্ষী সঙ্গে না থাক্‌লে এ-রকম সব ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অসম্ভব!"

নিজের মতের বিরুদ্ধে কথা শুনিলে অনেকে যেমন ক্ষেপিয়া উঠেন, মহেশবাবুও তেমনই খেপিয়া উঠিলেন; ঘন ঘন গোঁফ কাঁপাইয়া, গলার শিরা ফুলাইয়া, উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "কি বলেন গো!—জিজ্ঞেসা করবেন মিসিস্ দত্তকে; গণেশ চক্রোবর্ত্তীর ছেলে গৌরাঙ্গ চক্রোবর্ত্তীকে চেনেন সে, তিনি। জলজ্যান্ত মানুষকে খুন ক'রে ও-লোক সাম্‌লে নেয়! বিধবা বোন্ ছেলেমানুষ,—সে না হয় একটা ভুলই করে ফেলেছিল! তা ব'লে খুন করবে!—পেরমথ মিত্তির কনকনে আড়াই হাজার টাকা গুণে যোট বেঁধে নিয়ে গেল, আর মিসিস্ দত্ত নগদ সাত-শ!—পুলীশের দারোগা ভ্যাবা-চ্যাকা মেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল!—"

গৃহস্থ সকলে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্! কেবল অবিচলিত রহিলেন মিস্ স্মিথ্। বেশ শান্ত ভাবে, তিনি মহেশবাবুর হাত ধরিয়া নিজের পরিত্যক্ত চেয়ারটির উপর বসাইয়া দিয়া, স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ধীরে—মহাশয় ধীরে! আমার রোগী অত্যন্ত ক্লান্ত, একটু আস্তে কথা বলুন্ অনুগ্রহ করে।—হাঁ, তারপর বলুন্ এই জুলাই মাসে, ডেভ্?—হাঁ স্মরণ হয়েছে; সতেরই জুলাই সেই লাশ 'পোষ্টমর্টেম করবার জন্যে হাঁসপাতালে যায়, না?—আর আপনি এবং ঐ ভদ্রলোক, আর একটি অপরিচিত ব্যক্তি—তিনজনে একদিন ডাক্তার প্রমথবাবুর সঙ্গে, হাঁসপাতালে, আমাদের বসবার ঘরে বসেই ঐ টাকার কথা নিয়েই তর্ক করছিলেন নয়? ডাক্তারবাবু বোধ হয়, এই রিপোর্ট লেখ্‌বার জন্যই তিন হাজার টাকা চাইছিলেন না?"

অতিক্রোধীর মাথায় খুন চাপিলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না; অতিবক্তা মানুষের মনে বক্তৃতার ঝোঁক চাপিলে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে সে দ্বিধা করে না। মহেশবাবু সদর্পে বলিলেন, "তিন হাজার! পাঁচ হাজার চেয়েছিলেন!—আমি মাঝে ছিলুম, তাই আড়াই হাজারে পার পেলে! হয়-নয় সুধুন গৌরকে!—"

গম্ভীরভাবে স্মিথ্ বলিলেন, "ধন্যবাদ মহাশয়, গৌরকে জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন; আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা

করি। অনুগ্রহ করে রোগীর ধমনী-গতি গণনা করুন। এই নিন্ আমার ঘড়ি।—মনোযোগ দিয়ে গুণ্‌বেন, ভুল না হয়। নমিতা, আলোকটা দেখাও। সুরসুন্দর, একবার এ ঘরে এস।"

মিস্ স্মিথ, সুরসুন্দরকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। একটা অভাবনীয় আতঙ্কে নমিতার বুক দুড়্ দুড়্ করিতে লাগিল। এ সব কি ভীষণ কথা সে শুনিল! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে!......আজ সন্ধ্যার পর ডাক্তার মিত্রের নিকট যে-সব কথা সে শুনিয়াছে, তাহার আবছায়াগুলাও মনে পড়িতে লাগিল। নমিতার মাথার মধ্যে যেন গোলমাল বাধিয়া গেল।

স্বভাব-চঞ্চল মহেশবাবু দুই তিনবার গণনাকার্য্যে ভুল করিয়া, অনেক কষ্টে স্থির হইয়া, শেষে গণনা শেষ করিলেন। নমিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হাণ্ড্রেড টোয়েণ্টি ফাইব!—এ-রকম অবস্থায় এও ত বেশী:—খুবই বেশী।"

সংযত হইয়া নমিতা অনুমোদনের স্বরে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশী বৈ কি!—"

নিজের মত সমর্থন হওয়ায় মহেশবাবু অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "বেশী! কি বল এঁ্যা!"—তারপর "ক্ষীণে চ প্রবলা নাড়ী......"ইত্যাদি গড়্গড় করিয়া একনিঃশ্বাসে কতকগুলা কথা বলিয়া শেষে হঠাৎ বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা, তোমার নামটি কি মা?—"

"মা!"—নমিতার কান জুড়াইল! লোকটির এতক্ষণকার যথেচ্ছ বক্‌বকানি ও অতিবক্তৃতার চোটে তাহার কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছিল; এতক্ষণে তাহার মনের সমস্ত অবজ্ঞা-বিরক্তি মুছিয়া গেল! স্মিতমুখে সবিনয়ে সে বলিল, "আমার নাম,—কুমারী নমিতা মিত্র।—"

তিনি বলিলেন, "নমিতা মিত্র? নমিতা মিত্র?—কই, তোমার নাম ত শুনি নি! তুমি আর কখনো এদিকে 'কলে' আস নি, কি বল?—"

নমিতা সংক্ষেপে বলিল, "আজ্ঞে না। এই প্রথম।"

তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ওঃ তাই বল! এ তল্লাটে এলে আমি নিশ্চয়ই জান্‌তে পার্‌তুম। এদিকে সবই ত আমার রোগী!—আমায় না জানিয়ে কেউ অন্য লোককে আন্‌তে পারে না।—আমি যাকে বলে দেব, তাকেই আন্‌বে! বুঝ্‌লে মা, মিসেস্ দত্তকে,—সেও আমি তাঁর এদিকে পসার করিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, আলাপ-পরিচয় ত হোল; এবার থেকে তোমাকেও 'কল' দেব।"

নমিতা মনে মনে হাসিল; ভদ্রলোকের অভ্যাসটি বড় নিদারুণ! আত্মশ্লাঘা-প্রচারের ধূয়াটি কোন মতেই ছাড়িতে পারিতেছেন না। ধৈর্য্যশীল লোক হইলে ইহার সহিত সমানে বকিয়া বেশ কৌতুক জমাইতে পারে, কিন্তু নমিতার যে তত কথা কহিবার শক্তি নাই! বিপদ্ এড়াইবার জন্য নমিতা সদ্যঃ-প্রসূত শিশুটিকে দেখাইয়া বলিল, "ওর অবস্থা একবার দেখুন;—অনেকক্ষণ দেখা হয় নি।"

তিনি উঠিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মিস্ স্মিথ্ ও সুরসুন্দর আসিয়া ঘরে ঢুকিল। মহেশবাবু আর উঠিলেন না।

চন্দ্রনাথবাবুর দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর-নম্রস্বরে বলিলেন, "আপনাদের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করছি; বাধ্য হয়ে এখানে একটি অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের অবতারণা করা হচ্ছে। ত্রুটি নেবেন না।—" (ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

যাত্রী।

এস ওগো খেয়ার মাঝি,
পার করে' নেও মরে;
সারাদিনটা বসে' আছি
একলা নদীর পারে;
আঁধার নেমে আসছে ধীরে
ঐ যে দূরের সুনীল নীরে;
একা বসে' রইব কিরে
নির্জন নদীর ধারে?

ছিল যারা সাথের সাথী
গেল অপর পারে,
কেউ আমারে নেয়নি ডেকে
কেউ চাহে নি ফিরে'।
পারের সময় যায় যে তরে',
একা বসে' আছি তীরে,
ওগো মাঝি, ত্বরা করে'
দেও গো নদী পারটী করে'।

শ্রীনলিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

অষ্টাবক্রগীতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৃতীয় প্রকরণ।

শিষ্যানুভবপীযূষে জ্ঞাতেঽপি করুণাবশাৎ।
তদ্বিজ্ঞানপরীক্ষার্থং শিষ্যমাহ গুরুঃ পুনঃ ॥১॥

শিষ্য আত্মানুভবরূপ অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছে—ইহা বুঝিয়াও করুণাবশতঃ গুরু তাহার জ্ঞানের দৃঢ়তা পরীক্ষার্থ পুনরায় বলিলেন।১।

অবিনাশিনমাত্মানমেকং বিজ্ঞায় তত্ত্বতঃ।
তবাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য কথমর্থার্জ্জনে রতিঃ ॥১॥

অবিনাশী অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব যথার্থতঃ জানিয়াও আত্মজ্ঞ ও ধীর তোমার অর্থার্জ্জনে অনুরাগ কেন?

আত্মাজ্ঞানাদহো প্রীতির্বিষয়ে ভ্রমগোচরে।
শুক্তেরজ্ঞানতো লোভো যথা রজতবিভ্রমে ॥২॥

অহো! আত্মজ্ঞান না হইলেই ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট বিষয়ে প্রীতি জন্মে; যেমন শুক্তি বলিয়া জ্ঞান না থাকাতেই ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট রজতের প্রতি লোভ হয়।২।

বিশ্বং স্ফুরতি যত্রেদং তরঙ্গা ইব সাগরে।
সোঽহমস্মীতি বিজ্ঞায় কিং দীন ইব ধাবসি ॥৩॥

যেমন সাগরে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ আত্মাতেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়। সেই আত্মাই আমি—ইহা বুঝিয়াও (অর্থাদির প্রতি) কেন কাতরভাবে ধাবিত হও।৩।

শ্রুত্বা বিশুদ্ধচৈতন্যমাত্মানমতিসুন্দরম্।
উপস্থেঽত্যন্তসংসক্তো মালিন্যমধিগচ্ছতি ॥৪॥

বিশুদ্ধচৈতন্যমাত্র আত্মাকে সুন্দর বস্তুরও অতিক্রমকারী শুনিয়াও সমীপস্থ ইন্দ্রিয়াদি-বিষয়ে আসক্ত হইয়া লোকে কেন মালিন্য প্রাপ্ত হয় ?৪)

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
মুনের্জানত আশ্চর্য্যং মমত্বমনুবর্ত্ততে ॥৫॥

যিনি সর্ব্বজীবে আত্মাকে অবলোকন করেন ও আত্মাতে সর্ব্বজীব অবলোকন করেন, এতাদৃশ স্থিরধী ব্যক্তি বিষয়ে মমত্ব-বোধ করিবেন, ইহা অতি আশ্চর্য্য (অসম্ভাব্য) ৫।

আস্থিতঃ পরমাদ্বৈতং মোক্ষার্থেঽপি ব্যবস্থিতঃ।
আশ্চর্য্যং কামবশগো বিকলঃ কেলিশিক্ষয়া ॥৬॥

পরমাদ্বৈততত্ত্বে স্থিরচিত্ত এবং মোক্ষ-বিষয়ে একপ্রবণ ব্যক্তি কামবশীভূত হইয়া কেলিশিক্ষায় বিকল হইবেন—ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য।৬

উদ্ভূতং কামমমিত্রমবধার্য্যাতিদুর্বলঃ।
আশ্চর্য্যং কামমাকাঙ্ক্ষেৎ কালমন্তমনুশ্রিতঃ॥৭॥

জ্ঞানের বৈরী কাম চিত্তে উদ্ভূত হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় করিয়া (সংসারের) অন্তকালে অবস্থিত জ্ঞানীরা জ্ঞানবলশূন্যের ন্যায় কামবিষয় আকাঙ্ক্ষা করিবেন ;—ইহা অতি আশ্চর্য্য (অর্থাৎ জ্ঞানিগণের পক্ষে কাম-বশীভূত হওয়া অসম্ভব ৭।)

ইহামুত্র বিরক্তস্য নিত্যানিত্যবিবেকিনঃ।
আশ্চর্য্যং মোক্ষকামস্য মোক্ষাদেব বিভীষিকা ॥৮॥

ইহলোকে ও পরলোকে সর্ব্বত্র সুখভোগে নিস্পৃহ এবং নিত্য আত্মতত্ত্ব ব্যতিরেকে আর সমস্তই অনিত্য, এইরূপ যিনি অবধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ সচ্চিদানন্দসুখাভিলাষী ব্যক্তির তাদৃশ চিৎস্বরূপে বিভীষিকা হইবে—ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। (অর্থাৎ চিৎস্বরূপে অবস্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহারা বিষয়াদিতে কখনই আসক্ত হইতে পারেন না। অর্থাৎ অদ্বৈতদর্শীরা বিধিনিষেধের অতীত হইলেও অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না) ৮।

ধীরস্তু ভোজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি সর্বদা।
আত্মানং কেবলং পশ্যন্ন তুষ্যতি ন কুপ্যতি ॥৯॥

ধীরব্যক্তিকে সর্ব্বদা বিষয়ভোগ করিতেই দাও আর সর্ব্বদা পীড়াই দাও, তিনি কেবল আত্মদর্শন করেন ; হৃষ্টও হ'ন্ না, কুপিতও হ'ন্ না।৯।

চেষ্টমানং শরীরং স্বং পশ্যত্যন্যশরীরবৎ।
সংস্তবে চাপি নিন্দায়াং কথং ক্ষুভ্যেন্মহাশয়ঃ ॥১০॥

জ্ঞানবান্ মহাশয়েরা কর্ম্মনিরত নিজের শরীরকে অন্যশরীরের সহিত অবিশেষ জ্ঞান করেন ; এজন্য এক শরীর অন্য শরীরের স্তব বা নিন্দা করিলে, কেন তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইবেন ? ।১০।

মায়ামাত্রমিদং বিশ্বং পশ্যন্ বিগতকৌতুকম্।
অপি সন্নিহিতে মৃত্যৌ কথং ত্রস্যতি ধীরধীঃ ॥১১॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে যিনি কৌতুক-হীন মায়ামাত্র অবলোকন করেন, এতাদৃশ ধীরবুদ্ধি ব্যক্তি মৃত্যুর সন্নিহিত হইয়া কেন ভীত হইবেন ? (১১)

নিস্পৃহং মানসং যস্য নৈরাশ্যেঽপি মহাত্মনঃ।
তস্যাত্মজ্ঞানতৃপ্তস্য তুলনা কেন জায়তে ॥১২॥

নৈরাশ্যেও যে মহাত্মার মন নিঃস্পৃহ, সেই আত্মজ্ঞানতৃপ্ত ব্যক্তির কাহার সহিত তুলনা হইতে পারে ? (১২)

স্বভাবাদেব জানানো দৃশ্যমেতন্নকিঞ্চন।
ইদং গ্রাহ্যমিদং ত্যাজ্যং স কিং পশ্যতি ধীরধীঃ ॥১৩॥

যিনি দৃশ্যজগৎ স্বভাবতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানেন, সেই ধীরমতি ব্যক্তি কি "ইহা গ্রহণীয়, ইহা পরিত্যাজ্য" এইরূপ অবলোকন করেন? (১৩)

অন্তস্ত্যক্তকষায়স্য নির্দ্বন্দ্বস্য নিরাশিষঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো ভোগো ন দুঃখায় ন তুষ্টয়ে ॥১৪॥

যাঁহার অন্তঃকরণ হইতে রাগ-দ্বেষাদি সমস্ত প্রকার মলিনতা দূর হইয়াছে, যিনি সুখদুঃখের অতীত এবং জীবিতাদি-বিষয়েও নিরাকাঙ্ক্ষ, তাঁহার পক্ষে স্বভাবোপনত ভোগ দুঃখকরও হয় না, সুখকরও হয় না। ১৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার আক্ষেপ দ্বারা শিষ্যোপদেশ-নামক তৃতীয় প্রকরণ।

চতুর্থ প্রকরণ।

গুরুণৈবমুপাক্ষিপ্তঃ শিষ্যো জ্ঞানদশোল্লসন্।
জ্ঞানিস্বশেষচেষ্টানাং স্পষ্টমাচষ্ট সম্ভবম্॥

গুরুকর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত শিষ্য আত্মজ্ঞানে আহ্লাদিত হইয়া জ্ঞানিগণের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই যে শোভা পায়, তাহা স্পষ্ট বলিলেন।

হন্তাত্মজ্ঞস্য ধীরস্য খেলতো ভোগলীলয়া।
নহি সংসারবাহীকৈ র্মূঢ়ৈঃ সহ সমানতা ॥১॥

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যিনি আত্মজ্ঞ এবং ধীর, তিনি যদি ভোগলীলায় ক্রীড়া করিতে থাকেন, তথাপি সংসার-ভারবাহী মূঢ়গণ তাঁহার সহিত সমান হইতে পারে না। ১।

যৎপদং প্রেপ্সবো দীনাঃ শক্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
অহো তত্র স্থিতো যোগী ন হর্ষমুপাগচ্ছতি ॥২॥

অহো! ইন্দ্র প্রভৃতি সকল দেবতা যে সচ্চিদানন্দপদ পাইবার জন্য লালায়িত, যোগী সেই পদে অবস্থান করিয়াও হর্ষবিহ্বল হ'ন্ না (কিংবা তদপগমে উদ্বিগ্নও হ'ন্ না) ॥২॥

তজ্জ্ঞস্য পুণ্যপাপাভ্যাং স্পর্শো হ্যন্তর্ন জায়তে।
নহ্যাকাশস্য ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতিঃ ॥৩॥

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ জানিয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পুণ্য বা পাপের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না। যেমন ধূমের সহিত আকাশের সঙ্গতি দেখা গেলেও বাস্তবিকপক্ষে আকাশ ধূমের দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইতে পারে না। ৩।

আত্মৈবেদং জগৎসর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা।
যদৃচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ ॥৪॥

এই দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ কেবল আত্মাই—এই কথা যে মহাত্মা জানেন, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কার্য্য করিলে, তাঁহাকে কে নিষেধ করিতে পারে? (৪)

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তে ভূতগ্রামে চতুর্বিধে।
বিজ্ঞস্যৈব হি সামর্থ্যমিচ্ছানিচ্ছাবিবর্জনে ॥৫॥

আব্রহ্মস্তম্ব-পর্য্যন্ত চারিপ্রকার (অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, তির্য্যগ, ও আধিকারিক বা জ্ঞানী পুরুষ) জীবসমূহের মধ্যে যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনিই রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগে সমর্থ। ৫।

আত্মানমদ্বয়ং কশ্চিৎ জানাতি জগদীশ্বরম্।
যদ্বেত্তি তৎ স কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ ॥৬॥

কোন ব্যক্তি যদি আত্মাকে অদ্বিতীয় ও সর্ব্বেশ্বর বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি যাহা জানেন তাহাই করেন। তাঁহার ইহলোক বা পরলোকে কোনও ভয় থাকে না। ৬।

ইতি অষ্টাবক্রগীতার অনুভাবোল্লাস-নামক চতুর্থ প্রকরণ।

পঞ্চম প্রকরণ।

এবমুল্লাসষট্‌কেন স্বশিষ্যেঽপি পরীক্ষিতে।
গুরুদৃঢ়োপদেশার্থং লয়যোগমথাব্রবীৎ ॥১॥

এইরূপ উক্ত উল্লাসষট্‌কের দ্বারা স্বশিষ্যের জ্ঞানের যাথার্থ্য পরীক্ষিত হইলেও, গুরু উপদেশ দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য পুনরায় লয়যোগ বলিলেন।১।

নতে সঙ্গোঽস্তি কেনাপি কিং শুদ্ধস্ত্যক্তুমিচ্ছসি
সংঘাতবিলয়ং কুর্ব্বন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥১॥

হে শিষ্য, তোমার কোন বস্তুর সহিতই সম্পর্ক নাই, তুমি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ (অন্য বস্তুর দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, অমিশ্রিত), অতএব তুমি কি ত্যাগ করিবে? (কিই বা গ্রহণ করিবে?) তুমি এইরূপে পাঞ্চভৌতিক দেহের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হও।১।

উদেতি ভবতো বিশ্বং বারিধেরিব বুদ্বুদাঃ।
ইতি জ্ঞাত্বৈকমাত্মানমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥২॥

হে শিষ্য, সমুদ্রে যেমন বুদ্বুদসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ তোমা (আত্মা) হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহা জানিয়া সকলপ্রকার-ভেদশূন্য আত্মস্বরূপে লীন হও।২।

প্রত্যক্ষমপ্যবস্তুত্বাদ্ বিশ্বং নাস্ত্যমলে ত্বয়ি।
রজ্জুসর্প ইব ব্যক্তমেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৩॥

জগৎ প্রত্যক্ষ হইলেও কিছুই নহে; ইহা তোমাতে নাই। রজ্জুতে যেরূপ সর্প (ভ্রমবশতঃ) প্রত্যক্ষ হইলেও নাই, জগৎ সেইরূপেই প্রকাশিত; অতএব (যখন তোমা ছাড়া হেয় বা উপাদেয় আর কিছুই নাই, তখন) আত্মস্বরূপে লীন হও।৩।

সমদুঃখসুখঃ পূর্ণ আশানৈরাশ্যয়োঃ সমঃ।
সমো জীবিতমৃত্যো সন্নেবমেব লয়ং ব্রজ ॥৪॥

হে শিষ্য, তুমি সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণস্বভাব (সকল অভাব- বা অপূর্ণতা-বিরহিত); অতএব তুমি সুখে দুঃখে, আশা নিরাশায়, জীবনে মরণে সমান জ্ঞান করিয়া আত্মস্বরূপে লীন হও।৪।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় লয়চতুষ্টয়-নামক পঞ্চম প্রকরণ।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

গুরুণৈবং পরীক্ষার্থমুপদিষ্টে লয়ে সতি।
পূর্ণাত্মনো লয়াদীনাং শিষ্যোঽসম্ভবমব্রবীৎ ॥১॥

পরীক্ষার্থ গুরু এইরূপ লয়যোগের উপদেশ দিলে, শিষ্য পূর্ণস্বভাব আত্মার লয় অসম্ভব দেখাইলেন।১।

আকাশবদনন্তোঽহং ঘটবৎ প্রাকৃতং জগৎ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥১॥

আমি আকাশের ন্যায় অনন্ত, আর আকাশের তুলনায় ঘট যতটুকু আত্মার তুলনায় প্রকৃতি-বিনির্মিত জগৎও ততটুকু। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই।১।

এতদ্দ্বারা আকাশ হইতে ঘট ভিন্ন- অতএব জগৎ আত্মব্যতিরিক্ত;—এই শঙ্কা-নিরাসের জন্য বলিতেছেন।—

মহোদধিরিবাহং স প্রপঞ্চো বীচিসন্নিভঃ।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ॥২॥

আমি সেই আত্মা মহাসমুদ্রের ন্যায়, আর জগৎ তাহার তরঙ্গের তুল্য। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই।২।

এতদ্দ্বারা আত্মা সমুদ্রের মত বিকারী, এই শঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন।—

অহং স শুক্তিসঙ্কাশো রূপ্যবদ্ বিশ্বকল্পনা।
ইতি জ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ ॥৩॥

আমি সেই আত্মা শুক্তির ন্যায়, আর জগৎ-কল্পনা শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়।

ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মার ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই। ৩।

এতদ্দ্বারা আত্মা শুক্তির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, এই শঙ্কা নিরাসার্থ বলিতেছেন।—

অহং বা সর্বভূতেষু সর্বভূতান্যথো ময়ি।
ইতিজ্ঞানং তথৈতস্য ন ত্যাগো ন গ্রহো লয়ঃ॥৪॥

আমিই সর্বভূতে বর্ত্তমান, এবং সর্ব্বভূত আমাতে বর্ত্তমান। ইহাই যথার্থ জ্ঞান। অতএব আত্মারি ত্যাগও নাই, গ্রহণও নাই, লয়ও নাই॥৪॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতার উত্তরোপদেশচতুষ্ক-নামক ষষ্ঠ প্রকরণ।

সপ্তম প্রকরণ।

লয়যোগানমুষ্ঠানে ব্যবহারং নিরঙ্কুশম্।
আশঙ্ক্য শিষ্যঃ প্রোল্লাসাদব্রবীদ্ গুরু-
মুত্তরম্॥১॥

জ্ঞানী ব্যক্তি যদি লয়যোগের অনুষ্ঠান না করেন, তবে হয়ত তিনি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন, এই আশঙ্কার উত্তরে শিষ্য আত্ম-জ্ঞানোল্লাসিত হইয়া বলিতেছেন।১।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বপোত ইতস্ততঃ।
ভ্রমতি স্বান্তবাতেন মম নাস্ত্যসহিষ্ণুতা॥১॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ, জগৎরূপ জাহাজ ইহাতে চিত্তরূপ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; ইহাতে আমার অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবার কোন কারণ নাই। (অর্থাৎ জাহাজ যদি জলমগ্ন হয়, তাহাতে সমুদ্রের যেরূপ কোন ক্ষতি নাই, সেইরূপ দেহ-সহিত বিশ্বের পরিবর্ত্তনেও আমার কোন ক্ষতি নাই)।১।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ জগদ্বীচিঃ স্বভাবতঃ।
উদেতু বাস্তমায়াতু ন মে বৃদ্ধির্ন চ ক্ষতিঃ॥২॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ; ইহাতে জগৎ তরঙ্গস্বরূপ। সেই তরঙ্গ নিজের স্বভাবানুসারে (অর্থাৎ চিত্তের অবিদ্যা-কামকর্ম্মানুসারে) উত্থিত হউক্ বা বিলীন হউক্; তাহাতে আমার কোন লাভও নাই, ক্ষতিও নাই।২।

ময্যনন্তমহাম্ভোধৌ বিশ্বং নাম বিকল্পনা।
অতিশান্তো নিরাকার এতদেবাহমাস্থিতঃ॥৩॥

আমি চৈতন্যের মহাসমুদ্রস্বরূপ; ইহাতে নাম (ও রূপের) কল্পনাই জগৎ। আমি স্বভাবতঃ সর্ব্বপ্রকার-ক্ষোভ-বিবর্জ্জিত ও নিরাকার; সেই অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া আছি (অতএব লয়যোগানুষ্ঠান নিরর্থক)।৩।

নাত্মা ভাবেষু নো ভাবাস্তত্রানন্তে নিরঞ্জনে।
ইত্যসক্তোঽস্পৃহঃ শান্ত এতদেবাহমাস্থিতঃ॥৪॥

আত্মা দেহাদিপদার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এবং দেহাদি পদার্থ তাহাতে নাই (অর্থাৎ আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট বা মিশ্রিতভাবে নাই); কেন না, আত্মা অনন্ত এবং সর্ব্বপ্রকার মলিনতা-বর্জ্জিত। অতএব আমি অসক্ত (কোনবস্তুর সহিত সংলগ্ন নহি, অতএব বিশুদ্ধ), নিঃস্পৃহ (কারণ কোন বস্তুর দ্বারা আমার ক্ষতি বা বৃদ্ধি হইতে পারে না; কেননা সে বস্তু আমাকে স্পর্শই করিতে পারে না) এবং শান্ত (কারণ, কোন অপূর্ণতা বা অভাব নাই)।৪।

অহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালোপমং জগৎ।
অতো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥৫॥

অহো! আমি কেবল চৈতন্যস্বরূপ, আর এই জগৎ ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজীর প্রায়; অতএব কোন বস্তুতেই এবং কি করিয়াই বা হেয় বা উপাদেয় বোধ হইবে? (অর্থাৎ

সুখকর বস্তুই হউক্ আর অসুখকর বস্তুই হউক্, সমস্তই অচিরস্থায়ী; অতএব তাহা গ্রহণ বা ত্যাগ করিবার জন্য ব্যস্ততা কেন? সে-সকল ত আপনিই যাইবে। আর সে-সকল বস্তু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণও তাহার দ্বারা চৈতন্য-স্বরূপ আমার ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। আমার স্বরূপ কোনরূপেই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না; তাহার বৃদ্ধিও নাই, ক্ষয়ও নাই; তবে আর সুখ দুঃখ লইয়া রাগ-দ্বেষ কেন? সুখেও কিছু বাড়িবে না, দুঃখেও কিছু কমিবে না; চৈতন্য চিরকালই আছে এবং থাকিবেও।) ।৫।

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় অনুভবপঞ্চক-নামক সপ্তম প্রকরণ।

অষ্টম প্রকরণ।

ইত্থং পরীক্ষিতজ্ঞানং শিষ্যমেবাভিনন্দিতুম্।
গুরুর্বন্ধস্য মোক্ষস্য ব্যবস্থাং সম্যগব্রবীৎ ॥ ॥

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া, শিষ্যের যথার্থ জ্ঞানলাভ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গুরু তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্য বন্ধন ও মোক্ষের যথার্থ ব্যবস্থা বলিলেন ।১।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিদ্ধৃষ্যতি কুপ্যতি ॥১॥

যতক্ষণ চিত্ত কিছু পাইতে ইচ্ছা করে বা কিছুর জন্য দুঃখ করে, কিছু ত্যাগ করিতে বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, অথবা কিছুতে হৃষ্ট বা কিছুতে কুপিত হয়, ততক্ষণই জীবের বন্ধন। (অর্থাৎ কোন কিছুর অপেক্ষা থাকিলেই বন্ধন, সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ হইলেই মুক্তি) ।১।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥২॥

যখন চিত্ত কিছুই পাইতে ইচ্ছা করে না, কিছুর জন্যই দুঃখ করে না, কিছুই ত্যাগ করিতে বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে না, কিছুতে হৃষ্ট বা কিছুতেই কুপিত হয় না, তখনই মুক্তি ।২।

তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তং ন সক্তং সর্ব্বদৃষ্টিষু ॥৩॥

যখন চিত্ত কোনপ্রকার অনাত্মবস্তুতে আসক্ত, তখনই বন্ধন; যখন চিত্ত সকল অনাত্মবস্তুতে স্পৃহাত্যাগ করিয়াছে, তখনই মোক্ষ ।৩।

যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিন্মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা ॥৪॥

যখন অহংভাব দূর হইয়াছে, তখনই মোক্ষ; যতক্ষণ অহংভাব আছে, ততক্ষণই বন্ধন। এই কথা বুঝিয়া অবহেলার সহিত কোন বস্তু গ্রহণ করিও না বা কোনবস্তু ত্যাগ করিও না ॥৪॥

ইতি অষ্টাবক্রগীতায় বন্ধমোক্ষোপদেশ-নামক অষ্টম প্রকরণ।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা।

স্বভাবটি যেন পুণ্য আনন্দ-নিঝর্রি,
বহি যায় কুলু কুলু জুড়ায়ে অন্তর;
কৃত্রিমতা কৃষ্ণ-শিলা কুটিল কঠোর,
রোধি ধারা-পথে তারে বাধা দেয় ঘোর।

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

গানের স্বরলিপি।

মেঘরাগ—ঝাঁপতাল। *

প্রবল ঘন মেঘ আজি নীল ঘন ব্যোম 'পরে
আঁধার ঘন ঘোর ভানু চন্দ্র ছাই হে।
বরষিছে মুষলধার নাহি বিরাম আর,
বিশ্বপতি রাখ এ বিপদে বাঁচাই হে।
ত্রস্ত ধরণী 'পরে সকলি হে শঙ্কা করে,
পশু পক্ষী জল স্থল নদী নদ বায়ু
সকলি শঙ্কিত আজ ঘন ঘোর বরষায়,
জগপতি, চরণে রাখ শান্তি বিছাইহে॥

স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
II না না। না র্সা র্সা। না -া। -পা মা পা I
প্র ব ল ঘ ন মে ০ ঘ আ জি

২´ ৩ ০ ১
I না -া। -পা মা পা। মা -গা। মা রা -সা I
নী ০ ল ঘ ন ব্যো ম প রে ০

২´ ৩ ০ ১
I সা রা। -ম্রা মা পা। পা -া। -পা মা পা I
আঁ ধা ০র ঘ ন ঘো ০ র ভা নু

---

* ভারতীয় সঙ্গীত-পুস্তকাদিতে লেখা আছে যে, ছয়টী রাগের শব্দ বা স্বরের দ্বারা ছয়টী ঋতুর আদর্শ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। কয়েকটি রাগের গান মিসেস্ বি, এল্, চৌধুরী-মহাশয়ার দ্বারা পরিচালিত সঙ্গীত-সম্মিলনীর গত বারের অভিনয়ে, কলিকাতা ইউনিভারসিটী ইনিষ্টিটিউট্ হলে গীত হইয়াছিল। ঐ রাগগুলির গানের মধ্যে,এই গানটিও গাওয়া হইয়াছিল। গানটি আধুনিক মার্জ্জিত ভাষাতে রচিত নহে। সম্ভবতঃ, কবিকঙ্কন বা চণ্ডিদাস বা বিদ্যাপতির ধাঁচে রচিত; কিম্বা মেদিনীপুর বা বিষ্ণুপুরের গান-রচয়িতাদের ধাঁচে রচিত। কিন্তু একটি হিন্দি গানের ঠিক্ মাপে, সহজ ও ছোট ছোট বাণীনে রচিত বলিয়া গানটিকে রীতিমত অঙ্গরাগের ও মৃদঙ্গের ঠেকায় সহিত, ঠাঠের ভিতরে, দিনযামিনীর যে সময়েই হউক না কেন, গাহিতে পারিলে, অনেকটা অনুভব করা যাইতে পারিবে যে, বর্ষাকালের ভাবভঙ্গী বা ক্রিয়া-কলাপ যেন সে সময়ে উপস্থিত।

শ্রীমোহিনী সেনগুপ্তা।

২´ ৩ ০ ১
I না র্সা। র্রা র্সা -র্রা। না র্সা। না -া -পা I
ঘ ন ঘো ০ র ব র্ ষা ০ য়

২´ ৩ ০ ১
I র্মা র্গা। র্মা র্রা র্সা। না র্সা। না -পা র্সা I
জ গ প তি চ র ণে রা ০ খ

২´ ৩ ০ ১
I র্সা -া। -না পা -া। মা -পা। না -মা -পা II II
শা ন্ তি বি ০ ছা ই হে ০ ০

আমরা কেমন করে বেঁচে থাকি?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ডিম।

ডিমের মধ্যে দুইটী পদার্থ দেখা যায়; দুইটিই তরল। একটি সাদাটে; আর একটি হল্‌দে; এইটিকে কুসুম বলে। ডিম ফুটন্ত জলে ফেলিলে, সাদাটে জিনিষটি বেশ শক্ত হয় এবং বেশ শ্বেত-বর্ণ হয়। কুসুমও শক্ত হয়, কিন্তু অত নয়। দুই ভাগেই ছানার মত জিনিস আছে। কুসুমের মধ্যে ছানা ব্যতীত এক প্রকার স্নেহ-পদার্থ আছে, আর অল্প-পরিমাণে চিনি ও লবণ আছে। ডিম শুখাইয়া পুড়াইলে ছাই হয়; ছাইও লবণ। ডিমে এক প্রকার তৈলও আছে। ডিমে জল নাই বলিলে হয়। এখন দেখা গেল দুধ আর ডিমে একই প্রকার পদার্থ-সকল আছে। এই দুইই আদর্শ খাদ্য বা পূর্ণ-খাদ্য। ইহাদের মধ্যে জীবন-ধারণের সমস্ত উপকরণ পাওয়া যায়। এই উপকরণ-গুলি অন্য কোন একটি খাদ্যে পাওয়া যায় না।

এখন মাংসের কথা বলি। মাংসে শতকরা ৭৫ ভাগ জল; বাকি ২০ অংশে Albumin (ছানাজাতীয় পদার্থ) (আর ৫ ভাগ fat-স্নেহজাতীয় পদার্থ বা চর্ব্বি)। চর্ব্বি-বিহীন মাংসকে Lean বলে। খাঁটি মাংস Leanতে দুধের ছানা, ডিমের সাদা, Fat) চর্ব্বি, দুধের মাখম আর ডিমের স্নেহ-পদার্থের মতন জিনিষ থাকে। মাংসে শ্বেতসার (Starch) বা চিনি নাই। শ্বেতসারই শরীরে গিয়া চিনি হয়।

(Starchy) food শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্যের কথা বলি। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য শরীরে গিয়া চিনি হইয়া পড়ে; তাহাতে শারীরিক অগ্নি রক্ষা হয়। ইহা heat-making food অগ্নিপ্রদ খাদ্য পুষ্টিকর নয়। ফল, মূল, শাক, সব্‌জি, আনাজ, আলু, কপি ইত্যাদি সকলই শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য; ইহাতে proteid অতি অল্পই আছে। আলুতে ৭৫ জল। ডাল-কলাই-জাতীয় খাদ্যে অপেক্ষা-

ক্ষুত পুষ্টিকর পদার্থ বেশী থাকে। আমাদের দেশে চাল ও গম প্রধান খাদ্য। এই দুইটিতেই শ্বেতসার অধিক; পুষ্টিকর পদার্থ অল্প। গম অপেক্ষা চালে পুষ্টিকর পদার্থ অল্প। আমিষের proteid নিরামিষের proteid অপেক্ষা সহজ-পাচ্য এবং শীঘ্র রক্তের সঙ্গে মিশে।

আমাদের সকল প্রকার খাদ্যে জল থাকে, তথাপি আমাদের জল-পান করিতে হয়; শুষ্ক খাদ্যে শরীর রক্ষা হয় না। জল শরীরে শীঘ্র জ্বলে না বটে, কিন্তু জ্বলনের কার্য্যে সহায়তা করে। খাদ্যের সঙ্গেই আমরা নানা-প্রকার লবণ খাই, তথাপি (Table Salt) সামুদ্রিক লবণ খাইতে হয়। লবণ হাড়-পুষ্টি করে এবং শরীরের কব্জিগুলিতে তেল দেয়।

আমরা প্রতিদিন অনেক প্রকার খাদ্য খাই; কিন্তু সমস্তের মধ্যে প্রাধানতঃ তিনটি পদার্থ থাকে।—Proteid মাংসজনক, Starch শ্বেতসার এবং Fat স্নেহ-পদার্থ; এই কয়টিই প্রকৃত খাদ্য। মানুষ-মাত্রেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে এই প্রকার খাদ্য খাইয়া সুস্থ ও সবল থাকে। বড়মানুষরা নানাপ্রকার মুখ-রোচক স্বাদু খাদ্য ভোজন করেন; গরীবলোকেরা তা পায় না। তাহাতে ক্ষতি নাই, বরং অনেক সময় উপকার হইয়া থাকে। অনেক মসলা ও ঘি-তেলযুক্ত তরকারীতে অজীর্ণ-রোগ হইতে পারে।

Real and helpful অর্থাৎ প্রকৃত ও সহকারী খাদ্য ব্যতীত আর একপ্রকার পানীয় আছে। এইরূপ খাদ্যের সহায়তায় শারীরিক উপার্জ্জিত শক্তির নিকট হইতে অধিক কার্য্য লইতে হয়। এইরূপ খাদ্যকে whip বা চাবুক বলে। চাবুকের দ্বারা ঘোড়াকে যেমন চালাতে হয়, এই খাদ্যও সেইরূপ। এই whip বা চাবুক-খাদ্য উপার্জ্জন করে না; কিন্তু উপার্জ্জিত সামর্থ্য খরচ করে। ইহা খরচ করায় বলিয়াই আমাদের অধিক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ঘোঁড়াকে খাইতে না দিয়া শুধু চাবুকে কি চালান যায়!

Tea (চা), Coffe (কাফি), Coco (কোকো)—চাবুক-জাতীয় এইগুলি সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। কেহ এইগুলি ব্যবহার করিয়া ভাল থাকে, কেহ বা মন্দ থাকে।

চা ইত্যাদিতে কি উপকার হয়? চা শরীরে গিয়া জ্বলে না এবং কোন প্রকার নূতন শক্তিও উপার্জ্জন করে না। পরন্তু ইহা উপার্জ্জিত শক্তি খরচ করায়। উপার্জ্জিত শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলে, চা ইত্যাদির সহায়তায় মানুষ অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। অধিক ব্যয় হইলেই অধিক আয় চাই, সে-জন্য পরিশ্রমী লোকদের অধিক খাইতে হয় এবং তাঁহারা খাদ্যও বেশ জীর্ণ করিতে পারেন।

মদ একটি চাবুকজাতীয় দ্রব্য। চা এবং মদের ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেক বিধি-ব্যবস্থা আছে। সে সমস্ত কথা এখানে বলা যায় না। মোটের উপর সুস্থ ও সবল লোকের পক্ষে মদের কোন প্রয়োজন নাই। দুর্ব্বল, বৃদ্ধ এবং convalescent (যাহারা রোগ হইতে উঠিয়াছেন), তাহাদের পক্ষে হয়ত মদ্য-পান প্রয়োজনীয় হইতেও পারে, কিন্তু ধার্ম্মিক সুবিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ-ব্যতীত কাহারও মদ্য-ব্যবহার করা উচিত নয়। মদের অন্যান্য অনেক দোষ ব্যতীত একটি দোষ

এই যে, ইহার পানের প্রবণতা ক্রমেই বাড়িয়া যায়।

চা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এবং কাহার তাহা পান করা উচিত, আর কাহার বা পান করা উচিত নয়, সে বিষয়ে একটু বলি। আমাদের জঠরাগ্নি অল্প হইলে তাহাকে মন্দাগ্নি বলে। মন্দাগ্নি দুই-প্রকার হয়। খাদ্য-দ্রব্যের অল্পতা-বশতঃ, আর জঠরাগ্নির দৌর্ব্বল্য-বশতঃ মন্দাগ্নি হয়। প্রথম-শ্রেণীর মন্দাগ্নিতে চা-পান অনুপকারী এবং দ্বিতীয়-টিতে উপকারী।

চা-দানীটি বেশ শুষ্ক করিয়া তাহাতে ফুটন্ত জল ঢালিবে এবং তাহাতে চা ফেলিয়া দিবে। ৩।৪ মিনিটের উপর উহা রাখিবে না। কারণ, বেশীক্ষণ রাখিলে Tanic Acid হয় (যাহাতে চামড়া হয়)। ইহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। খালি পেটে চা-পান করিবে না। চা-পান করিবার সময় অন্ততঃ একটু কিছু খাইবে। পূর্ব্বে যদি যথেষ্ট পরিমাণে আহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরিপাক-কার্য্য বাড়াইবার জন্ত চা আবশ্যক। চা একপ্রকার Stimulant বা উত্তেজক দ্রব্য; অর্থাৎ ইহা রক্তের Circulation (গতি) বৃদ্ধি করে।

আহারের সময় ও পরিমাণ ঠিক্ রাখিতে হয়; এবং Proteid, Starch, Fat, Salt, Water—এই সমস্ত যথাপরিমাণ হওয়া চাই। পরিমাণ বেশী বা কম হইলে অমৃতেও বিষ হয়। খাদ্যের মধ্যে লোহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু থাকা চাই; কারণ আমাদের রক্তে লোহা আছে। কোন কারণে রক্তের লোহার ভাগ কম হইলে আমাদের বর্ণ ফ্যাকাসে হয়। রোগ হইতে আরোগ্য হইবার পর ডাক্তারে যে 'টনিক' ঔষধ দেন, তাহাতে প্রায়ই লৌহ থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজমোহন বসু।

হিন্দুর তীর্থনিচয়।

কামাখ্যা।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের কামরূপ-জেলায় কামাখ্যা অবস্থিত। এখানকার মন্দিরটী সতীর নামে উৎসর্গীকৃত। উক্ত মন্দির নীলাচল-পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এস্থানে ব্রহ্মপুত্র-নদ প্রবাহিত। মহাভারতের সমসাময়িক নরক-নামে জনৈক রাজপুত্র মন্দিরটী প্রথমে নির্ম্মাণ করেন। পর্ব্বতে অরোহণ করিবার জন্ত যে বাঁধ তিনি বাঁধিয়া-ছিলেন, তাহার অস্তিত্ব এখনও বর্ত্তমান আছে। কালে মন্দিরটী লোপ পায়। পরে বিশ্বসিং পূত স্থানটীর আবিষ্কার করিয়া তথায় একটি মন্দির-নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কালা-পাহাড়-নামক জনৈক ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান তাহার ধ্বংস করে। ১৫৬৫ খৃঃ, নরনারায়ণ-নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা মন্দিরটী নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে দেবীর নিকট ১৪০টী নরবলি পড়ে। নরনারায়ণের মন্দিরের এখন কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। মন্দিরটী যে-স্থানে অবস্থিত তথায় সতীর যোনিদেশ পতিত হয়। সতীর মৃত্যুতে মহাদেব যখন সতীকে স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ

ঘুরিতেছিলেন, তখন সংসাররক্ষা-হেতু বিষ্ণু সুদর্শনচক্রের দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। যে যে স্থানে সতীর অংশ পতিত হয়, তথায় একএকটী পীঠস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে। কামাখ্যায় দেবীর যোনীদেশ পতিত হইয়াছিল। এই জন্য ইহা হিন্দুতীর্থ-রূপে পরিণত হইয়াছে। ভারতের সকল স্থান হইতেই এস্থানে লোক তীর্থ করিবার জন্য সমাগত হয়। পর্ব্বতোপরি আরও ছয়টী মন্দির আছে; তন্মধ্যে অধিকাংশই দ্বারভাঙ্গার মহারাজ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই মন্দিরগুলির অস্তিত্ব ১৮৯৭ খ্রীঃ, ভূমি-কম্পের পর হইতেই হইয়াছে। শৈলোপরি আরোহণ করিলে, নদী ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান-গুলির দৃশ্য এত রমণীয় বোধ হয় যে, তাহা ব্যক্ত করার শক্তি মানবলেখনীর নাই। আসামের রাজগণ কামাখ্যাদেবীর সেবার জন্য ২৬০০০ বিঘা জমী ব্রহ্মোত্তররূপে দান করিয়াছেন। সহৃদয় ব্রিটীশরাজও তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন। খৃষ্টমাস বা বড়দিনের সময় এখানে পৌষ-বিয়া নামে একটী উৎসব হইয়া থাকে। যে-সময়ে কামাখ্যা-দেবীর সহিত কামেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল, এই উৎসবটী তাহারই স্মারক। এতদ্ব্যতীত বাসন্তীপূজা ও দুর্গোৎসব যথাক্রমে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে অতিশয় আড়ম্বরের সহিত হইয়া থাকে।

এখানে যেমন অন্যান্য সম্প্রদায় আছে, তেমনই তান্ত্রিকও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা পঞ্চ-মকারের সাধক। পঞ্চ-মকার যথা, (১) মদ্য, (২) মাংস, (৩) মৎস্য, (৪) মুদ্রা ও (৫) মৈথুন। অন্যান্য সম্প্রদায় পঞ্চ-মকারের যেমন বিকৃত অর্থ করে, ইহারা তেমন করেন না। ব্রহ্মরন্ধ্র সরসীরুহ হইতে ক্ষরিত অমৃতধারা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দময় হয়, তাহাকেই ইহারা মদ্যসাধক বলেন। মাংস-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, মা-শব্দে রসনা; তদংশ-ভক্ষণশীল ব্যক্তি মাংস-সাধক। অর্থাৎ বাক্য-সংযমকারী মৌনাবলম্বী যোগিব্যক্তিকে ইহারা মাংসভুক্ বলেন। ছাগ-মেষাদি-মাংসে পরিতৃপ্ত হইয়া যে, ভগবদারাধনা করিয়া ভববন্ধনে পরিমুক্ত হইবে, এরূপ অর্থ ইহারা মনে করেন না। মৎস্য-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, গঙ্গা-শব্দে ইড়ানাড়ী, যমুনা-শব্দে পিঙ্গলা-নাড়ী। এই ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে নিরত গতায়াত-কারী যে নিঃশ্বাস- ও প্রশ্বাস-রূপী মৎস্যদ্বয় যিনি ভক্ষণ করেন অর্থাৎ যিনি প্রাণায়াম-সাধক শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিরোধ করিয়া কেবল কুম্ভকের পুষ্টি করিতেছেন, তাঁহাকেই মৎস্যাশী বলিয়া ইহারা উক্ত করেন। নতুবা সামান্য-জলচর-মৎস্যাদি-ভক্ষণপটু ব্যক্তিকে ইহারা মৎস্য-সাধক বলেন না। মুদ্রা-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, শিরসি স্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারার ন্যায় শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ তরলরূপ আত্মার অবস্থিতি; কোটি সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ, অথচ তিনি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। অতিশয় কমনীয়-সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট এবং মহাকুণ্ডলিনী শক্তি-সংযুক্ত সেই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান যাঁহার জন্মে, তাঁহার নাম মুদ্রাসাধক; নতুবা কতক-গুলি মদ্যোপযোগী সামান্য ভক্ষ্যদ্রব্যকে মুদ্রা বলিয়া ইহারা উপদেশ করেন না। মৈথুন-সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, মৈথুন-শব্দে রমণ। যাঁহারা আত্মাতে রমণ করেন, তাঁহাদিগের

নাম আত্মারাম। এতাদৃশ রমণশীল ব্যক্তির নাম মৈথুনসাধক। নতুবা স্ত্রী-সঙ্গমকে ইহারা মৈথুন বলেন না। পঞ্চ-মকারের এই ব্যাখ্যাটি "আগমসার"-নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কামাখ্যাতে দুর্গা- ও বাসন্তী-পূজার খুব ধূম হয়। হিন্দুরা দুর্গাকে পরব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। দুর্গ-শব্দে সংসার, অব্যয়ার্থ আ-নিস্তার। যাঁহাকে জানিতে পারিলে সংসার-দুঃখের নাশ হয়, তাহাই দুর্গা-নামে অভিহিত। অতএব দুর্গা যে পরমাত্মস্বরূপা, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। দুর্গাপূজায় আমরা রাজনীতির উপদেশ পাইয়া থাকি। রাজাগণ এই ধরণীমণ্ডলকে পরাক্রম-দ্বারা লাভ করেন। সেই পরাক্রমের প্রধান উপকরণ—বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী। ইঁহাকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে ইঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজারা পররাজ্য-জয় করিয়া থাকেন। উপস্থিত শত্রুবিগ্রহে প্রভূত ধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া রত্ন-পেটিকাকে দক্ষিণ-হস্তের আয়ত্ত স্থানাদিতে রক্ষা করিতে হয়। যুদ্ধকালে হস্ত্যশ্বাদির আরোহী সেনাপতি দুইপার্শ্বে-সৈন্যকে রক্ষা করে। পরসৈন্য-বন্ধনের জন্য পাশাদি বন্ধন-রজ্জু প্রস্তুত থাকে। সিংহের বিক্রমে শত্রুকে আক্রমণ করিয়া আত্ম-মৃত্যুকে জর্জ্জরীভূত করিয়া বিশিষ্টরূপ বন্ধনে রাখিতে হয়। এবং ক্ষুদ্র শত্রু যদি নিরস্ত্র হয়, তথাপি তাহাকে সশস্ত্র-জ্ঞানে নিপীড়ন করিবার যত্ন করা আবশ্যক। কেবল সুশিক্ষিত একাস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ হয় না, এজন্য নানাবিধ অস্ত্রশিক্ষা দেখাইয়া শত্রুকে হতপরাক্রম করা উচিত। যুদ্ধকালে রাজাকে বহুদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। যদি এরূপ আয়োজনের ন্যূনতা হয়, তবে কখনই রাজা সম্যক্ জয়লাভ করিবার পাত্র হইতে পারেন না। লোককে এই উপদেশ দিবার জন্য পরমেশ্বর মহিষমর্দ্দনচ্ছলে দুর্গারূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

দশভুজা দেবী দশভুজচ্ছলে বিবিধাস্ত্র শিক্ষার উপদেশ করিয়াছেন। রাজ-সকল বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে বামে রাখিয়া যুদ্ধকালে তাহার সহিত মন্ত্রণা করিবেন, এ-কারণ বিদ্যা-বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীকে তিনি বামে রাখিয়াছেন। উপস্থিত সংগ্রামে প্রভূত ব্যয় হয়; কিন্তু যাহাতে বহুকালাত্যয় না হয়, সে-জন্য রত্নপেটিকা দক্ষিণ হস্ত-সন্নিধিতে রাখিতে হইবে; ইহা দেখাইবার জন্য তিনি সর্ব্ব-রত্নাধিষ্ঠাত্রী কমলাকে রত্নপেটিকার ন্যায় দক্ষিণ ভাগে সংস্থাপিত করিয়াছেন। আরোহি-সৈন্য-নায়কের প্রয়োজন জন্য কার্ত্তিকেয়কে বামপার্শ্বে, ও হস্ত্যারোহি-সৈন্য-নায়করূপে গজানন গণেশদেবকে দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি সংস্থাপন করিয়াছেন। শত্রুপক্ষে সিংহ-বিক্রমে যাইতে হইবে, তাহা দেখাইবার জন্য দেবী সিংহবাহিনী হইয়াছেন। সর্ব্বসমুদ্যোগি-রাজা কখন শত্রু-কর্ত্তৃক হত হয়েন না, এ-কারণ মৃত্যুঞ্জয়াখ্যাপনার্থে মৃত্যুরূপ মহিষকে পাশে বদ্ধ করতঃ অস্ত্রক্ষত করিয়া রাখিয়াছেন। নিরস্ত্র শত্রু হইতেও সশস্ত্র শত্রুর উত্থান হয়, ইহা জানাইবার জন্য মহিষ-মুখ হইতে শস্ত্রপাণি-পুরুষোত্তব দেখাইয়াছেন। এরূপ সমুদ্যোগি-রাজা দশদিক্কে অধিকৃত করিয়া একসাম্রাজ্য লাভ করেন। এইজন্য দেবী দশভুজা হইয়া এক এক দিক্পতির অস্ত্র এক এক হস্তে ধারণ করিয়া সর্ব্বলোককে

উপদেশ করিয়াছেন যে, এই সমুদ্রমেখলা ধরণীর দিক্‌পতি-সকল এবম্ভূত রাজার অঙ্গতলে অধিবাস করেন। ত্রিনয়ন-ধারণের উদ্দেশ্য—রাজা বহুদৃক্ হইবেন; অর্থাৎ রাজার উর্দ্ধাধঃ সর্ব্বদিকেই দৃষ্টি থাকিবে। অর্দ্ধচন্দ্র-ধারণচ্ছলে সর্ব্বত্র সমান স্নেহের বিধান অর্থাৎ সাধুপালন ও অসাধুপীড়ন রাজার ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণচ্ছলে, রাজা যে উদ্দীপ্ত তেজস্বী, ইহাই জানাইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুর্গাকে হিন্দুরা পরমাত্মা বলিয়া মান্য করেন। সেই দুর্গার শরৎকালীন দুর্গোৎসব ও বসন্তকালের বাসন্ত্যুৎসব হইয়া থাকে। একই দুর্গার বৎসরে দুইবার পূজা করারও একটু অধ্যাত্ম তত্ত্ব আছে। দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ দুইটী পথ। দক্ষিণায়ন পিতৃযান, এবং উত্তরায়ণ দেবযান। আশ্বিনীয় কৃত্য পিতৃযানে, চৈত্রীয় কৃত্য দেবযানে হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি-মার্গে যে কর্ম্ম সেই কর্ম্ম দক্ষিণায়নে এবং নিবৃত্তি-মার্গের কর্ম্ম উত্তরায়ণে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ-কারণ শাস্ত্র বলেন যে, দেবতা-দিগের দিন উত্তরায়ণ এবং রাত্রি দক্ষিণায়ন। সুতরাং, দিবা ভিন্ন রাত্রিকালে পূজা করিতে হইলেই অসময়-বোধে দেবতাকে জাগাইতে হইবে। ইহারই নাম বোধন। উত্তরায়ণ জাগ্রদাবস্থা; এই সময়ে দেবগণ স্বভাবতঃ চৈতন্যবিশিষ্ট হওয়াতে বোধনের আবশ্যক হয় না। অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিতি করিয়া নিবৃত্তিমার্গের কার্য্যলাভের প্রত্যাশা করিলেই, ঐ প্রবৃত্তিমার্গস্থিত ব্যক্তিরা তাহাকে নিবৃত্তি-মার্গ করিয়া তাহাকেই বোধন বলে। প্রবৃত্তি-মার্গ সংসার এবং নিবৃত্তিমার্গ সন্ন্যাস। প্রবৃত্তি-মার্গস্থ সংসারী ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যসুখ-সম্পত্তি-লাভার্থ অশ্বমেধাশ্বকল্প দুর্গোৎসব করিয়া তৎপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে ঐহিক নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পরে সুরলোকে গমন করেন। নিবৃত্তিমার্গে জ্ঞানিগণের ইহাতেই মোক্ষ-নিবৃত্তি লাভ করেন। সুরথ ও সমাধি উভয়েই দুর্গোৎসব করেন; কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গে সাধিতা দেবী সুরথকে মনুস্বপদ প্রদানে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিলেন। নির্ব্বিণ্ণচেতা সমাধি নিবৃত্তি-মার্গে ঐ দুর্গোৎসব করেন; এজন্য তাঁহাকে আপনার স্বরূপতত্ত্ব যে তত্ত্বজ্ঞান তাহা ঐ জ্ঞানশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। লোকে উত্তরায়ণ বসন্তকালকে শুদ্ধকাল বলিয়া বাসন্তী-পূজার বোধন করে না। কারণ, এইকালে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা থাকেন। উত্তর-শব্দে সর্ব্বশেষ। অয়ন-শব্দে আশ্রয়। সর্ব্বশেষ তদ্‌বিষ্ণুর পরমপদে আশ্রয় ইত্যর্থে উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন শরৎকালে দেবীবোধনের প্রথা আছে। কারণ, এইকালে কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রাবস্থায় থাকেন। পিতৃলোককামী সংসারী ব্যক্তি পিতৃযান অর্থাৎ দক্ষিণায়নে চন্দ্রলোকে গমন করে, ও পুনর্ব্বার তথা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহলোকে জন্মগ্রহণ-করতঃ পুনঃ কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত হইয়া নিয়ত বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান-ফলে পুনরপি স্বর্গলোকে গমন করে এবং ভোগাবসানে সংসারে পুনরাবৃত্ত হয়। এইরূপে সংসৃতির নিবৃত্তি হয় না। পুনঃ পুনঃ যাতায়াত-রূপে লোকেরা পরিশ্রমের অনুভব করিতে থাকে, কোন মতে বিশ্রান্তি-সুখলাভ করে না। দেবযানে আরূঢ় হইয়া নিষ্কারণে কর্ম্মাদি সম্পন্ন করিলে সূর্য্যলোকে গমন-

করতঃ আদিত্যদ্বারে বৈশ্বানরাখ্য পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় এবং আর তাহার পুনরাবৃত্তি থাকে না। হিন্দুরা পিতৃপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ করিয়া দেবার্চ্চনা করেন। ইহার নাম পঞ্চ-ব্রত। এই ব্রত অবলম্বন করিলে পঞ্চদশ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অবরোধ করিতে হয়। পঞ্চজ্ঞানে-ন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং পঞ্চভূত-তন্মাত্র—এই পঞ্চদশবৃত্তি আচরণের নাম পঞ্চব্রত। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন হয়। এই ষষ্ঠি তিথি উপাসনা-ভেদের সময়বিশেষমাত্র। ষষ্ঠী যেমন কালাবয়ব তেমনই যোগাবয়ব। যোগাবয়ব উপাসনার ছয়টী আকৃতির নাম—আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ইহাই ষড়ঙ্গ যোগ-নামে খ্যাত। প্রতিপৎ আসন-যোগ, দ্বিতীয়া প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সংযমন-যোগ, তৃতীয়া প্রাণায়াম-যোগ, চতুর্থী ধ্যান-যোগ, পঞ্চমী ধারণাযোগ, ষষ্ঠী সমাধি-যোগ; ইহা দেখাইবার নিমিত্ত প্রতিপদাদি দ্রব্যদান শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রতিপদে দেবীকে রজতাসন দিবে। ইহাতেই আসন-যোগ বলা হইল। দ্বিতীয়াতে কেশ-সংযমনার্থ ডোরক-দানচ্ছলে ইন্দ্রিয়-সংযমন প্রত্যাহারযোগ উক্ত হইয়াছে। তৃতীয়াতে নাসাভরণ স্বর্ণরজত-নির্ম্মিত-তিলকদানচ্ছলে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে। রজতাকার ইড়া, স্বর্ণাকার জ্যোতির্ম্ময়ী পিঙ্গলা, ইহারা নাসা-ভ্যন্তরচারিণী পূরক-রেচকাদি-লক্ষণান্বিতা। সুতরাং, ইহাতে প্রাণায়ামযোগ বলাই সঙ্গত হইয়াছে। চতুর্থীতে উচ্চাবচ-ফলদানচ্ছলে জগতের অভিলষিত ফলপ্রদাতা পরমেশ্বরের অনুস্মরণরূপ মনন-ধ্যানযোগের উপদেশ করা হইয়াছে। পঞ্চমীতে কর্ত্তিকা-দানচ্ছলে ধারণাযোগ কথিত হয়; অর্থাৎ অসারবর্জ্জন-পুরঃসর সার-সঙ্কারণ ধারণাযোগ। ষষ্ঠীতে পঞ্চগব্য-মধুপর্ক-প্রদানচ্ছলে সমাধিযোগোপ-দেশ করা হইয়াছে; অর্থাৎ মধুধারা-পানে আসক্ত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান যায়, সমাধিতেও বাহ্যজ্ঞানের অবসান হয়। সুতরাং, সময়ে সময়ে অধ্যাত্মচিন্তক যোগী একএক যোগের যে ক্রমে অভ্যাস করিবে, তদ্দৃষ্টান্ত কালাবয়ব প্রতি-পদাদি তিথি-ক্রমে এক এক দ্রব্য-দানচ্ছলে ষড়ঙ্গযোগোপদেশ বুঝান হইয়াছে। কোষত্রয়ে উত্তীর্ণ সাধক অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ, অর্থাৎ সমাধির অবসানে বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিবে। তাহাই সঙ্কেত-দ্বারা প্রতিপৎ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী পর্য্যন্ত কল্পপূজোপলক্ষে ষষ্ঠীর অবসান-বেলাতে অর্থাৎ সায়ংকালে বোধন করিতে কহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্যজ্ঞান ও বিজ্ঞান-প্রাপ্তির নাম বোধন। সুতরাং, সমাধির পর প্রাপ্ত বিজ্ঞানকোষ-সাধকের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে চৈতন্যস্বরূপা কুণ্ডলিনীর প্রবোধন হয়। তদ্বোধন-ব্যতীত বিশ্রান্তি-সুখলাভ হয় না। অনন্তর সপ্তমী অষ্টমী নবমীতে আনন্দময়-কোষপ্রাপ্ত জীব জীবন্মুক্তের ন্যায় নিত্য মহোৎসবযুক্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকে। এ-কারণ আনন্দময়ী ভগবতী দুর্গার মহামহোৎসব নবমীতেই হয়; অর্থাৎ ইহাকেই শারদোৎসব বলে। তবে যে শ্রীফল-বৃক্ষে বোধন-শব্দ দেখা যায়, তাহার অর্থ এই যে, শ্রী-শব্দে ঐশ্বর্য্য; ঐশ্বর্য্য হইয়াছে যাহার ফল, তাহার নাম শ্রীফল। সুতরাং শ্রীফল বলাতে ব্রহ্মাণ্ড বুঝায়। ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণ আছে, কলেবরেও তাহা আছে। যথা, "ব্রহ্মাণ্ডে

যে গুণাঃ সন্তি তে বসন্তি কলেবরে"। শ্রীই শরীরের ফলস্বরূপ ; এ-কারণ দেহকে শ্রীফল বলিয়া এখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীফলে ব্রহ্মরূপ-জ্ঞানশক্তির শয়ন বলাতেই জীব-শরীরে প্রসুপ্ত চৈতন্যশক্তির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তন্নিদ্রাভঙ্গ-পদে চৈতন্যরূপা কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগরিত-করণ বুঝায়। প্রাণায়াম-জপ-যজ্ঞ বিনা তাঁহার বোধন হয় না। সুতরাং, দুর্গোৎসবোপলক্ষে অধ্যাত্ম-তত্ত্বান্বেষণ-পক্ষে, ভোগপর তমোময় অজ্ঞান-রূপ রাত্রিতে, প্রসুপ্তবৎ জ্ঞানাত্মক আত্মবোধের নিমিত্ত, অপর পক্ষে নবম কলায় শ্রীবৃক্ষে বোধনের উপদেশ করা হইয়াছে।

কিরীটেশ্বরী।

মুর্শিদাবাদ-নগরের গঙ্গার অপর পারে ডাহাপাড়া-নামক একটী পল্লী আছে। ডাহাপাড়া ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে অবস্থিত। এই ডাহাপাড়ার সার্দ্ধক্রোশ পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্রপল্লী আছে। ইহাই কিরীটকণা-নামে খ্যাত। কিরীটকণা এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ, পরন্তু শান্তিময়ী। প্রবাদ এইরূপ, দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেন। সেই সময় দেবীর কিরীটের একটী কণা এই স্থানে পতিত হয়। তজ্জন্য ইহা উপপীঠ-মধ্যে পরিগণিত। কালীঘাটে যেমন একটী স্পষ্টমূর্ত্তি আছে, কিরীটেশ্বরীর সেরূপ নাই। একটী উচ্চ বেদীর পশ্চাতে একখণ্ড বিশাল প্রস্তর ভিত্তির ন্যায় উচ্চভাবে অবস্থিত। স্থানটী নানাবিধ শিল্পকার্য্যে অলঙ্কৃত। বেদীর উপর দেবীর মুখমাত্র অঙ্কিত। বেদীর নিম্নে বসিবার স্থান আছে। গৃহভিত্তির কতকটা কৃষ্ণমর্ম্মর-প্রস্তরে মণ্ডিত। মন্দিরের সম্মুখে একটী বিস্তৃত বারাণ্ডা। এখানকার শিবমন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তর-খোদিত শিবলিঙ্গ এবং ভৈরব-মন্দিরে কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত ভৈরবমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। হরিনারায়ণ রায় ইহার খননকর্ত্তা। কিরীটেশ্বরীর মন্দির জীর্ণাবস্থায় অবস্থিত। পৌষমাসের প্রতিমঙ্গলবারে এস্থানে মেলা বসিয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

সাধে বাদ।

যে-দিন শচী-বক্ষচ্যুত মন্দার-পুষ্পের মত নির্ম্মল দুইটি ক্ষুদ্র বালকবালিকাকে স্বামীর হস্তে সঁপিয়া গৃহিণী চক্ষু মুদিলেন, বিপন্ন রাম-দয়ালের যথার্থই সে-দিন জগৎ অন্ধকারময় হইয়া গেল। তাঁহার এমন অর্থ ছিল না যে সংসারের ও অনাথ শিশুদের তত্ত্বাবধানের জন্য কোন লোক নিযুক্ত করেন ; এমন কোন স্নেহশীল আত্মীয় ছিল না যে, এই নিরা-শ্রয়দের স্নেহের বক্ষে তুলিয়া তাহাদের মাতৃহীনতার দারুণ ব্যথার লাঘব করে! সুতরাং, একা রামদয়ালের উপরেই শিশু-পালন, ও গৃহস্থালীর সমস্ত ভারই আসিয়া পড়িল। তবে, পৈতৃক কিছু জমী-জমা থাকায় উদরান্নের চিন্তা হইতে ভগবান্

রামদয়ালকে মুক্তি দিয়াছিলেন। পৈতৃক ভিটায় বসিয়া সামান্য সম্পত্তিটুকু নাড়িয়া চাড়িয়াই তাঁহার দিন চলিয়া যাইত।

কিন্তু এই দীনহীনের ঘরে ভগবান্ কোন্ সাধনার ফলে এই জীবন্ত ছবি-দুইখানি আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন! অদৃষ্টের ঘনান্ধকারের ভিতরে এই সমুজ্জল রত্ন-দুইটি রামদয়ালের ভগ্ন কুটির আলো করিয়াছিল। নবনীকোমল দেহ-মাধুর্য্য, সে অমরলাঞ্ছিতা রূপপ্রভা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! রামদয়ালের শত দুর্ভাগ্যের ভিতরেও তাহাকে এই অমূল্য রত্নের অধিকারী দেখিয়া লোকে তাহার ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না। আর তাহাদের ভাগ্যপীড়িত বেদনা-ক্লিষ্ট পিতা সেই মুখ-দুইখানির প্রতি চাহিয়া নিজের সমস্ত দুর্ভাগ্য বিস্মৃত হইত।

নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অন্ধকার-ললাটে দুঃখের যে গুরু আসন পাতিয়া স্থান লইয়াছিল, সরল বালকবালিকা তাহার কোন ধারই ধারিত না। সর্ব্বদুঃখহারী একমাত্র পিতৃস্নেহে তাহাদের সকল অভাবের মোচন হইয়াছিল। নন্দনের প্রস্ফুট পারিজাতের মত কোমল কোরক-দুইটি তাহাদের বাগানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়াইত; প্রাতে পিতার পূজার পুষ্প চয়ন করিত এবং যথাসাধ্য গৃহ-কার্য্যে পিতার সাহায্য করিত। এমনি করিয়া রামদয়ালের সেই ক্ষুদ্র সংসারখানি সুখে দুঃখে কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু হায়! সমুদ্র যেমন অতল, দুঃখও বুঝি তাই! হতভাগ্য মাতৃহীনদের ভাগ্যে এ-সুখটুকুও সহিল না! হঠাৎ এই অনাথ-দুইটিকে অকূলে ভাসাইয়া রামদয়াল একদিন চক্ষু মুদিলেন। স্নেহের পুত্র সরোজ তখন সবে অষ্টাদশবর্ষের বালকমাত্র; গৃহে তাহার ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া অবিবাহিতা ভগ্নী লাবণ্য! জগতের একমাত্র-আশ্রয়-চ্যুত হইয়া ভাইভগ্নী ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। ভীষণ সংসার অকূল সমুদ্রের মত হু হু করিতেছে! এই বিপুল পৃথিবীতে ধনহীন বন্ধুহীন নিরাশ্রয় অনাথ-দুইটি আজ কাহার চরণে মাথা রক্ষা করিবে ভাবিয়া পায় না।

২

অনাথদিগের এই বিপদের দিনে অতি-দূর-সম্পর্কীয়া এক পিসীমা আসিয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন। পিসীমা ঘোষবংশীয় জমীদার-গৃহের বধূ। চির-প্রসন্না কমলা তাঁহার সুপ্রসন্ন হস্তখানি আজ-কাল ধীরে ধীরে ঘোষ-বংশের উপর হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন; তবে কর্ত্তা ও গৃহিণীর ভক্তির মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিতে ছিলেন না। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার প্রস্থান-দ্বার যে অবারিত হইয়া উঠিবে, তাঁহাদের বংশধরদের আচার-ব্যবহারে এ-কথা সকলেই স্বীকার করিত। ধর্ম্ম, বিনয় ও সৌজন্যের স্থলে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদ্ধত্য প্রভৃতি আসিয়া আশ্রয় লইতেছিল।

পিসীমা যখন সকল দুঃখ, সকল দৈন্য নিজের অঞ্চলে ঢাকিয়া অনাথ-দুইটিকে নিজ-বক্ষে স্থান দিলেন, তখন তাঁহারই পুত্র বিপিন লাবণ্যের অপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

পিতার মৃত্যুর পর সরোজকে জীবিকার চেষ্টায় ক্রমাগত নানাস্থানে ঘুরিতে হইত। সে-সময় লাবণ্য পিসীমার গৃহে বাস করিত।

সেই সুযোগে বিপিন লাবণ্যকে আশা মিটাইয়া দেখিয়া লইত। ইহার ফলে বিপিন আত্মহারা হইয়া পড়িল। লাবণ্যকে পাইতে যে কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিতে পারে, সে কথা মোটেই তাহার মনে স্থান পাইল না; বরং দারিদ্র্য-নিপীড়িতা লাবণ্যলতা অতিশয় অনায়াস-লভ্যা, ইহা ভাবিয়াই সে আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, সুবিধা-মত তাহার মাতাকে জানাইয়া সরোজকে একবার বলিলেই হইবে। এ-বিবাহে দুইপক্ষের কাহারও অমতের কারণ সে দেখিতে পাইল না। সম্প্রতি তাহার পিতা এক মোকদ্দমায় ব্যস্ত আছেন; সেটা চুকিয়া যাইলেই সে কথাটা পাড়িবে স্থির করিল।

৩

"সরোজ! বাড়ীতে আছ কি?" এই বলিয়া একটি সুন্দর দেবমূর্ত্তি যুবা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য তখন প্রাঙ্গণে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পূজার জন্য ফুল তুলিতেছিল; স্বর শুনিয়া মুখ ফিরাইতেই দুইজনেই ক্ষণেক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল! উভয়েরই পরস্পরকে মনে হইল—কি সুন্দর! দুই জনেরই চক্ষু আর ফিরিতে চায় না! একটু পরেই লাবণ্যের সংজ্ঞা হইল; সে চক্ষু নমিত করিয়া লইয়া উত্তর করিল, "দাদা তো বাড়ী নেই।"

"ওঃ, আচ্ছা। সে আসিলে বলিবে, প্রমোদ আসিয়াছিল।" এই বলিয়া যুবা বাহির হইয়া গেল।

"প্রমোদ!" আহা, নামটিও কি মিষ্ট! রূপের অনুরূপ বটে! নবীনা লাবণ্যলতা তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া অন্যমনা হইয়া পড়িল।

সরোজ আসিলে, তাহার স্নানের উদ্যোগ করিতে করিতে লাবণ্য বলিল, "দাদা তোমার কাছে একটি লোক এসেছিলেন। তাঁর নাম বল্লেন—প্রমোদ। তিনি কে দাদা?"

স। কে! প্রমোদ এসেছিল! বড় ভাল রে বড় ভাল! আহা, ওর কপালও আমাদেরই মত। অগাধ সম্পত্তি আছে বটে, কিন্তু ছোট বেলাতেই ওর মা মারা গেছেন! সম্প্রতি মাস-দুই হ'ল, ওর বাপও মারা গেছেন। তাই একলা থাক্‌তে না পার্‌লেই মাঝে মাঝে পিসীর বাড়ী আসে। আমায় বড় ভালবাসে। এত বড়-লোকের ছেলে, তবু ওর স্বভাবের গুণে একটুও পর বলে মনে হয় না; ওকে ঠিক আমার নিজের ভাইয়ের মত মনে হয়।

লাবণ্য ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ওঁর পিসি, দাদা?"

স। আমাদের অরুণের জ্যাঠাই-মা।

লা। ওঃ বটে!

লাবণ্য সেদিন সকল কাজের মধ্যে এক-খানি মধুর মূর্ত্তির ধ্যানে বিভোর রহিল।

সন্ধ্যাকালে, 'সই! ঘাটে যাবি না, ভাই?"—বলিতে বলিতে নির্ম্মলা দাওয়ায় উঠিয়া ঘরে উঁকি দিল; দেখিল এই প্রদোষকালেও লাবণ্য শয্যায় উপর পড়িয়া আছে। নির্ম্মলার ডাক তাহার কাণে পৌঁছিল কি না বলিতে পারা যায় না; কারণ, তখনও লাবণ্য উদাস-দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। নির্ম্মলা একেবারে তাহার গায়ের উপর গিয়া হাসিয়া পড়িল ও বলিল, "কি ভাই! কাকে ভাবছিস্? ধ্যানের ছবি পেয়েছিস্ না-কি?"

"না পেলে তুই ঘাড়ের উপর এলি কি ক'রে ?" বলিয়া দুই হাতে লাবণ্য নির্ম্মলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল।

নির্ম্মলা বলিল, "না ভাই, আজ তোর এ-ছল রেখে দে। আমায় ভালবাসিস্ বটে, তা আমার জন্যে জান্‌লার বাইরে চাইবি কেন ? আমায় যদি ভাব্‌তিস, ওই দাওয়ায় বসে দোরের দিকে চেয়ে থাক্‌তিস্! বল না সই, কা'কে ভাব্‌ছিলি ?"

ঈষৎ হাসিয়া লাবণ্য উত্তর করিল, "আর কা'কে ভাই ! নিজের অদৃষ্টকে।"

"বটে ! তা ভাই, তোর অদৃষ্ট কি বল্লে ? আমার কিন্তু ভাই, একটা বড় সাধ উঠেছে ! তোর যুগ্যি একটি বর এখানে এসেছে। তার সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হ'ত—।" কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া দুইহাতে নির্ম্মলার কপোলযুগল নাড়া দিয়া লাবণ্য উত্তর করিল, "কে সে কার্ত্তিকপুরুষটি ?—সয়া না-কি ? নইলে তুই অত সুন্দর কা'কে পেলি !"

মধুর হাসিতে ঠোঁট নড়িয়া নির্ম্মলা কহিল, "ঠাট্টা করিস্ নে ; কাল্‌কে যাই অত ভাল-বেসেছিলাম, তাই তুই সুন্দর নিয়ে ঘর ক'রে বাঁচ্‌বি। চল্ ভাই, সন্ধ্যে হয়, ঘাটে চল্।"

দুই সখীতে নদীতে অঙ্গ ডুবাইয়া গল্প করিতে লাগিল। সে গল্পের আর শেষ নাই। কথায় কথায় নির্ম্মলা বলিল, "সই আস্‌চে মাসে বোধ হয় আমায় নিয়ে যাবেন্। তোর বিয়েটা আর দেখা হ'ল না।"

প্রফুল্লমুখী লাবণ্য একগাল হাসিয়া উত্তর করিল, "তাই তো,—বরমহাশয় তো বিষয়-কার্য্যে অবসর পেলেন্ না যে, একবার যমপুরী থেকে গাত্রোত্থান কর্‌বেন ! তা সই, তোমার মনের সাধ মনেই রইল বই কি ! চল, এদিকে যে রাত হ'য়ে এল ; বাড়ীতে তো আমার কাজ আছে !"

নি। তুই দেখ্‌চি একেবারে হাল্ ছেড়ে দিয়েছিস্ ! ভয় কি সই ? আর কেউ না আসে, সইকে সতীন কর্‌তে পারবি নে ?

"দূর হ" বলিয়া লাবণ্য নির্ম্মলার গা ঠেলিয়া দিল।

দুইজনে যখন জল হইতে উঠিয়া বাড়ীর পথ ধরিল তখন অর্দ্ধেক পথ আসিয়াই দুই সখীই থমকিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ ও সরোজ ঠিক্ সেই পথ দিয়াই আসিতেছিলেন। তাঁহারাও মধ্য-পথে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা লাবণ্যের গা টিপিয়া বলিল, "সই, দেখেছিস্ ! লাবণ্য চাতুরী করিয়া বলিল, "কে বল্ দেখি ?"

নির্ম্মলা কানে কানে বলিল, "আমার সয়া।"

"তোমার মাথা" বলিয়া লাবণ্য মুখ ফিরাইল। প্রমোদ ও সরোজ সে-পথ ছাড়িয়া অন্যদিকে ফিরিলেন। পথে প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজ ! তোমার ভগ্নীর কোথায় বিবাহ হয়েছে ?" একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরোজ উত্তর দিল, "সে এখনও কুমারী।"

বাড়ী গিয়া প্রমোদ পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সরোজের বোন্‌কে দেখেছ পিসীমা ?"

এক গাল হাসিয়া পিসীমা উত্তর দিলেন, "তা আর দেখি নি ! সে যে আমাদের লাবণ্য রে !"

মৃদুকণ্ঠে প্রমোদ বলিল, "বেশ সুন্দরী !—"

প্রমোদের মুখের অসমাপ্ত কথা কাড়িয়া লইয়া পিসীমা উত্তর দিলেন, "সে আর বল্‌তে !

প্রমোদ, তোর ওকে বৌ কর্‌তে ইচ্ছে করে ?" সলাজ হাসি হাসিয়া প্রমোদ মুখ নত করিল। পিসীমা বলিতে লাগিলেন, "তা হ'লে, সে আর যে কি ভাল হয়, আর তোকে কি বল্‌ব! গরিবের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মেয়ে যার ঘরে যাবে, তার ভাগ্যের সীমা নেই! তার ওপর তুই তো রাজ্যেশ্বর, প্রমোদ! গরিবের এ দায় উদ্ধার কর্‌লে স্বর্গে থেকে দাদা তোকে সহস্র আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।"

নিম্নস্বরে প্রমোদ উত্তর দিল, "আমি অত শত জানি না। তোমাদের ইচ্ছা হয়, ঠিক্ কর। তবে আমি একবার পশ্চিম যাব ঠিক্ করেছি। তুমি তো জানো, পিসীমা, এবার হরিদ্বারে গিয়ে স্বামীজীর কাছে দীক্ষিত হ'য়ে আস্‌বার কথা আছে। ফির্‌তে মাস-ছয়েকের বেশীও হয়ে যেতে পারে। সেখান থেকে ফিরে না এলে, ও-সব কিছু হবে না।"

"তা তুই ঘুরে ফিরে আয় না? আমি এদের তা হ'লে কথাটা দিয়ে রাখি। আহা, সরোজের এই দুঃখের ওপর বোনের বিয়ের ভাবনা কি কষ্টকরই হয়েছে! ছেলেটা তবু একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।"

হাসিয়া প্রমোদ বলিল, "সে যত না বাচুক্, তুমি দেখ্‌চি বেশী আরাম পাও। পরের দুঃখে গলে যাওয়া তোমাদের ভাই-বোনের জন্ম-গত স্বভাব!"

পিসী। আশীর্ব্বাদ করি তোরও তাই হোক্, প্রমোদ!

৪

প্রমোদ ও লাবণ্যের বিবাহ-সম্বন্ধের কথা অচিরেই গ্রামময় প্রচারিত হইয়া গেল। বিপিন ইহা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। হাজার রূপ থাক্, তবু অত দরিদ্রের কন্যা কেহ যে সাধিয়া লইবে, এ-চিন্তা ভ্রমেও তাহার মনে আসে নাই। সে জননীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা একি সত্যি?"

মাতা। কি সত্যি রে?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বিপিন বলিল, "এই লাবণ্যর বিয়ের কথা।"

জননী হর্ষগদ্‌গদ-স্বরে বলিলেন, "হাঁ বাবা! রামদয়াল-দাদা পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, এইবার তার ফল ফলেছে। যেমন জগদ্ধাত্রীর মতন মেয়ে, তেমনি বর মিলেছে।

বিপিন দেখিল মাতার কথার সুর ভিন্ন পথেই বহিয়া যায়। সে ঈষৎ বিরক্তস্বরে বলিল, "কেন? এ গ্রামে কি আর ভালঘর বর নেই! তুমি প্রমোদকে দেখেই যে একেবারে গলে গেলে!"

পূর্ব্ববদ্‌ভাবেই জননী বলিতে লাগিলেন, "অমনটি আর কই বাবা! তা ছাড়া, যাদেরই ছেলেটি ভাল, তা'রাই তো গরিবের মেয়ে বলে নাক সিঁটুকে সরে যাচ্ছে। রূপগুণের আদর কি আর আছে! তা' হ'লে অমন মেয়ে কি আর এতদিন আইবুড় থাকে?"

তীব্রস্বরে বিপিন বলিল, "কেন? আমাদের ঘর কি প্রমোদের চেয়েও খাট? না, আমরা গরিব ব'লে কোন দিন নাক সিঁটকুই?"

জননী এইবার বিপিনের মনের কথা ধরিলেন; বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "তুই বিয়ে ক'র্ত্তে চাস্?"

বিপিন নতমস্তকে সম্মতি জানাইল। জননী তখন ঈষৎ হাস্যে বলিলেন, "তা তো হয় না, বিপিন! তা হ'লে কি এতদিন বসে থাকত!"

বিপিন একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলিল, "কেন হয় না ?" *

মাতা বলিলেন, "কুলে বাধে বাবা ! সে সব বোঝাতে গেলে তুমি এখন বুঝবে না ; তাও যদি না হ'ত, এখন, যখন এক জায়গায় সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে গেছে, তখন কি সেটা ভেঙে দিতে আছে ?" পরে পুত্রের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি বলিলেন, "আমার বিপিনের বৌ আনতে সুন্দর মেয়ের জন্যে ভাবতে হবে না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বিপিন আপন মনে উচ্চারণ করিল, "লাবণ্য কি আর দু'টো জন্মেছে ?"

বিপিন জানিত, নির্ম্মলা আজ-কাল শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে ; লাবণ্য একাই ঘাটে কাপড় কাচিতে যায়। সন্ধ্যাবেলা ঘাট হইতে ফিরিবার পথে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়া বিপিন লুকাইয়া পথের পানে চাহিয়া রহিল। ঐ না লাবণ্য আসিতেছে ? হাঁ, ঐ তো বটে ! ঐ তো সেই অপূর্ব্ব চলন-ভঙ্গী ! পথ-ঘাট আলো-করা ঐ তো সেই রূপ ! বিপিন নিকটে একটু অন্তরালে দাঁড়াইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে পথে ঘাটে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সেই আবছায়ার মধ্যে হঠাৎ সম্মুখে একজন পুরুষ দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া দুই পদ পশ্চাতে সরিয়া গেল ও সবিস্ময়ে উচ্চারণ করিল, "কে ?" কিঞ্চিৎ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া স্নেহকোমল স্বরে বিপিন বলিল, "ভয় কি লেবু ! আমি বিপিন ! চিনতে পারছ না ?"

একটু আশ্বস্ত স্বরে লাবণ্য উত্তর করিল, "ওঃ বিপিন-দা ! আমার হঠাৎ এমন ভয় হয়েছিল ! তবু ভাল, তুমি !" এই বলিয়া লাবণ্য পুনরায় গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

বিপিন ডাকিল, "শোন লেবু, একটা কথা আছে।

ফিরিয়া লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, "কি ?"

বি। লেবু ! আমি ছোটবেলা থেকে তোমায় কত ভালবাসি জান তো ?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লাবণ্য বলিল, "তা আর জানি নে, বিপিন-দা ! দাদা আর তুমি কি আমার ভিন্ন ? পিসীমার পেটে হয়েছ বটে, কিন্তু এক মায়ের পেটের ব'লেই আমরা জানি।"

বি। লেবু দিনে দিনে তুমি যত বড় হয়েছ—আমার অন্তর্নিহিত ভালবাসাও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়েছে ! তোমার ঐ অপূর্ব্ব রূপশ্রীর দিকে চেয়ে তা'রই আশায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি দিন কাটাচ্ছি, লাবণ ! এখন শুনছি না-কি তুমি অপরের পত্নী হবে ? লেবু ! আমার চেয়ে কে তোমায় ভালবাসবে ?

বিস্ময়বিস্ফারিত-চক্ষে বিপিনের মুখের প্রতি চাহিয়া লাবণ্য উত্তর দিল, "আমায় এ কথা বলছ বিপিন-দা !"

বি। হ্যাঁ লেবু !

"বিপিন-দা তোমার মনের অবস্থা প্রকৃতিস্থ আছে তো ? কা'কে কি বলছ বুঝতে পারছ কি ? আমি যে লাবণ্য !"

'হা হা' করিয়া হাসিয়া বিপিন বলিল, "তুমি লাবণ্য জেনেই তো তোমার কাছে এসেছি। শোন লাবণ্য ! আমি জানতাম যে-দিন চেষ্টা কোর্ব্বো, সেই দিনই আমি তোমার স্বামী হ'তে পারব। কিন্তু মাঝে থেকে প্রমোদ এসে পড়ে যে আমার সকল সুখে বাদ সাধবে তা কখনো ভাবি নি। তার উপর আজ মা'র কাছে জেনেছি

তোমার সঙ্গে আমার সামাজিক বিবাহে বাধা পড়ে। লেবু, ছার দে-বিধি, ছার সে সমাজ! প্রেমের চেয়ে উচ্চ কি? শুধু তুমি আমায় ভালবাস্‌বে, এইটুকু জান্‌বার অপেক্ষায় আছি। শুধু একটি কথা বল, লাবণ্য! তুমি আমার হ'বে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া লাবণ্য বলিল, "বটে! আচ্ছা, সে কথা শুন্‌লে, তারপর?"

বি। তারপর পিতা, মাতা, দেশ, ঘর, সব ছেড়ে শুধু তোমায় নিয়ে পৃথিবীর নির্জ্জন প্রান্তে গিয়ে বাস কোর্ব্বো, লেবু! আমাদের সে-রাজ্যের প্রাণী কেবল তুমি আর আমি—।

"থাম! ছিঃ ছিঃ বিপিন-দা কথাগুলো মুখে একটু বাধ্‌ল না? সরে যাও সাম্‌নে থেকে; আমায় বাড়ী যাবার পথ দাও।"

নির্লজ্জ বিপিন আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন লাবণ্য! প্রমোদের কাছে কি আমার চেয়ে ভালবাসা পাবে? সে কি আমার চেয়েও তোমায় সুখী কর্‌বে মনে কর?"

তীব্র ঝঙ্কারে লাবণ্য উত্তর করিল, "কি মনে করি, না করি, তা জন্‌বায় তোমার কোন দরকার নেই। যদি ভাল চাও, স'রে দাঁড়াও।"

বি। বটে! দীন-দরিদ্রের কন্যা ধনীর বধূ হবে ভেবে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছ! জেনে রেখো লাবণ্য! আমার বক্ষে আঘাত দিয়ে কখনও—কখনও সুখী হ'বে না। এখনও ভেবে দেখ!

লা। বিপিন-দা, এখনও বল্‌ছি স'র, নইলে এখনি চীৎকার কর্‌ব! দেখ আমরা বাড়ী থেকে খুব বেশী দূরে নেই।"

বি। আচ্ছা দেখে নেবো। মনে থাকে যেন এর শোধ তুলে তবে ছাড়্‌ব।

বিফল আক্রোশে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে বিপিন স্থানত্যাগ করিল। (ক্রমশঃ)

ননীবালা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ভাইস-চ্যান্সেলার।—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সলার অনারেবল ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি সার ল্যান্সেলট সাণ্ডারসন ভাইস-চ্যান্‌সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিকেল দু-আনি।—রূপার দাম অত্যন্ত বাড়িয়া যাওয়ায় নিকেলের মুদ্রা প্রচলন করিতে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইয়াছেন। সম্প্রতি নিকেলের নূতন দু-আনি বাহির হইয়াছে। দেখিতে ইহা একআনির ন্যায় চক্‌চকে; তবে চৌকোণা। একদিকে চারিভাষায় দুই আনা লেখা; অপর দিকে ভারতসম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। আকারে ইহা দু-আনি হইতে অনেক বড়।

বাঙ্গালা-অনুবাদক।—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদক রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করায়, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালার অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, রাজেন্দ্রবাবুর ন্যায় অবিনাশবাবুও এই কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন।

হোমরুল লীগের প্রতিনিধিগণের ইংলণ্ড যাত্রা।—হোমরুল লীগের পক্ষ হইতে গত ২৭ শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত তিলক, খাপার্দ্দে, করণ্ডীকর, কেলকার ও বিপিনচন্দ্র পাল বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন; তথা হইতে কলম্বো যাইয়া জাহাজে উঠিবেন এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ড গমন করিবেন।

বঙ্গে বস্ত্র-সমস্যা।—বস্ত্রের বাজার দিন দিন চড়িতেছে। ইহার প্রতীকারের চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য সম্প্রতি এক কমিটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অনারেবল মিঃ পি আর ক্যাডেল, সি, আই, ই, মূল্য-নিয়ামক নিযুক্ত হইয়াছেন। বস্ত্রের এবং কার্পাসের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া যায় কি না, কার্পাসের ব্যবসায়ে বাঁধাবাঁধি করা চলে কি না, এই বিষয়ে তথ্যনির্ণয় করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে কমিটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই ক্যাডেল সাহেবই সেই কমিটির অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যত শীঘ্র সম্ভব বোম্বাই সহরে এই কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবে। বোম্বাইয়ের চেম্বার অব-কমার্স, মিলওনার্স এসোসিয়েশন, আমদাবাদের মিলওনার্স এসোসিয়েশন, করাচীর চেম্বার অব কমার্স এবং কলিকাতার চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি কয়েকটী বাছা বাছা বণিক-সমিতি কমিটির নিকট এ-সম্বন্ধে অভিমত জানাইতে আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

বিবিধ সংগ্রহ।

ইংলণ্ডে নারীর অধিকার-বৃদ্ধি।—ইংলণ্ডের নারীরা ব্যবহারজীবের ব্যবসায় গ্রহণ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মে যে বিল প্রস্তুত হইয়াছে, সম্প্রতি লর্ড সভায় উহা তৃতীয়বার পাশ হইয়াছে।

প্রধান সেনাপতি।—ফ্রান্সের জেনারল ফক্ ইংরাজ, ফরাসী ও মার্কিন সৈন্যের প্রধানসেনাপতি-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল ফকের বয়স এখন ৬৭ বৎসর। ইনি যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত। রণ-কৌশল-সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াও ইনি যশস্বী হইয়াছেন। ফ্রান্সে যে দেশের যত সৈন্য আছে, তাহাদিগকে একজনের আজ্ঞাধীন না করিলে জর্ম্মণবল-বিনাশ করার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই, এই ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে।

লণ্ডন সহরে আহত সৈনিকদিগের জন্য একটী বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আহত নৌ-সৈনিকেরা এখানে বয়নশিল্প শিক্ষা করিবে।

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বন্ধুতা।—যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত

উপাধি ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইত না, কিন্তু জর্ম্মণ বিশ্ব-বিদ্যালয় সে উপাধির সম্মান করিতেন। সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ও এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, আমেরিকার উপাধি গ্রাহ্য করিতে হইবে।

আবর্জ্জনার মধ্য হইতে অর্থলাভ।—ইংলণ্ডে আবর্জ্জনার মধ্য হইতে রত্ন সংগৃহীত হইতেছে। ইংলণ্ডের খাদ্য-নিয়ামক বিভাগ গৃহস্থদিগকে নেকৃড়া, পুরাতন কাগজ, তামা ও লোহার বাসন, ভাঙ্গা কাঁচ, নানাপ্রকার টিন, কৌটা ও রান্নাঘরের আবর্জ্জনা প্রভৃতি একত্র করিয়া রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। খাদ্য-নিয়ামক বিভাগ পচা মাছ ও মাংস হইতে তৈল বাহির করিয়া এঞ্জিনে ব্যবহার করাইতেছেন। পচা ডিম, বাঁধাকপির পাতা প্রভৃতির দ্বারা হাঁস-মুর্‌গী প্রভৃতির খাদ্য তৈয়ার করিতেছেন। কসাইখানা ও কলকারখানার আবর্জ্জনা হইতে চর্ব্বি ও গ্লিসারিণ সংগ্রহ করিতেছেন। কলার কাঁদি হইতে 'পটাস' তৈয়ার করা হইতেছে।

মাছ, মাংস, মাখন প্রভৃতি যে-সকল কার-খানায় কৌটাবদ্ধ করা হয়, তাহার পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে আহারের উপযুক্ত উত্তম চর্ব্বি পাওয়া যাইতেছে। পুরাতন টিন, ভাঙ্গা পিত্তল, তামা, কেট্‌লি, কড়াই, হাতা, পেরেক প্রভৃতি সংগ্রহ করা হইতেছে। নটিংহাম নগরে এক বৎসরে যে ভাঙ্গা টীন সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাতে ১০ হাজার ৮০০ মণ লোহা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে যুদ্ধের উপকরণ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

ভদ্রবংশের মেয়ে চিনিবার কতকগুলি লক্ষণ।

জগতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নপ্রকারের সৌন্দর্য্যের আদর। এক দেশের সুন্দর ব্যক্তি অপরদেশে কুৎসিত। সৌন্দর্য্যের ন্যায় শিষ্টাচারও নানাদেশে নানাপ্রকার। কয়েকটী দেশের শিষ্টাচারের কতকগুলি নিয়ম প্রায় একই প্রকার। পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ভদ্র-বংশের মেয়েদের দিকে লক্ষ্য করিলে নিম্নলিখিত কতকগুলি আদব-কায়দা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সবগুলি সকলের, বোধ হয়, মনঃপূত হইবে না। যেগুলি তাহাদের অপছন্দ হইবে, সেইগুলি তাঁহারা বর্জ্জন করিতে পারেন।

১। গৃহে প্রবেশ ও গৃহ হইতে বহির্গমন কালে ভদ্রবালিকাগণ সর্ব্বদা বয়োজ্যেষ্ঠাগণের পশ্চাৎ গমন করে।

২। শকটে আরোহণ বা উৎসবালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ভদ্রবালিকা বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীর পশ্চাদ্‌গামিনী হয়।

৩। গৃহে সমবয়স্কাদের সহিত কোন আমোদ-প্রমোদ করিবার সময় ভদ্রবালিকা

পরিবারের জ্যেষ্ঠগণের প্রতি বিনয়-প্রকাশ করিতে তাচ্ছীল্য করে না।

৪। ভদ্রবালিকা afternoon tea বা dinnerএতে নিমন্ত্রিত হইলে অযথা গল্প, জল্পনা, উচ্চহাস্য ইত্যাদি করে না; বরং নিজের সম্মানরক্ষা করিয়া মৃদুহাস্য করিয়া থাকে।

৫। কাহারও সহিত পরিচিত হইতে হইলে বয়োজ্যেষ্ঠাগণ অগ্রে আলাপ করে; সর্ব্বপশ্চাতে সর্ব্বকনিষ্ঠ বালিকা পরিচিত হয়।

৬। ভদ্রবালিকা অহঙ্কৃত হয় না; কোনও প্রকার খোষামোদও কাহার নিকট করে না।

৭। কেহ কোন গোপনীয় কথা বলিলে, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করে না।

৮। ভদ্রবালিকা এমন ভাবে চলে, যাহাতে অন্যেরা তাহার সম্বন্ধে কোন কথা রটাতে বা আলোচনা করিতে না পারে।

৯। ভদ্রবালিকা পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা করে না। সর্ব্বপ্রকার ধৃষ্টতা তাহার পরিত্যাজ্য। তাহার আত্মসম্মান-বোধ থাকে।

১০। ভদ্রবালিকা কর্কশতা-পরিত্যাগ করিয়া বরং নম্র হয়; কিন্তু প্রতিশোধ লয় না।

১১। ভদ্রমেয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা বা কর্ত্রীর নিকট আতিথ্যের গুণগ্রাহিতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

১২। ভদ্রবালিকা জনসাধারণের মধ্যে কোনও পুরুষের নিকট হইতে মাথা নোয়াইয়া বা "thank you" না বলিয়া কোন কাজ নেয় না। কোন দ্রব্য মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহা কুড়াইয়া দিতে, ছাতা মাটি হইতে উঠাইয়া দিতে, কিংবা ঐরূপ সামান্য কাজ করিবার জন্য পুরুষ ব্যস্ত হয়, ভদ্রবালিকাও ধন্যবাদ না দিয়া উহা গ্রহণ করে না।

১৩। ভদ্রমেয়েরা এমন কোন কাজ খুব কম করে, যাহার জন্য তাহাদের অন্যের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।

১৪। ভদ্রবালিকা অন্যের নিকট নিজেকে ভদ্রবংশের বলিয়া বেড়ায় না। সে যে ভদ্রবংশের, তাহা তাহার আকার-ইঙ্গিতেই বুঝা যায়।

শ্রীসুষমা সিংহ।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গো ও মহিষের বয়স দাঁত দেখিলেই নির্ণীত হইতে পারে। কোন্ কোন্ বয়সে কোন্ কোন্ দাঁত উঠে, তাহার তালিকা দিয়ে দিতেছি:—

২½ বৎসরে	২ স্থায়ী দাঁত
৩½ বৎসরে	৪ ঐ
৪ হইতে ৪½ বৎসরে	৬ ঐ
৫ বৎসরে	৮ ঐ

শেষোক্ত স্থায়ী দাঁতের জোড়া, মাড়ি হইতে তৃতীয় জোড়া বাহির হইলেই, পড়িয়া যায়; এবং ৪½ বৎসর বা ততোধিক কাল অতীত না হইলে, সে স্থান পূর্ণ হয় না। উত্তমরূপ আহার পাইলে দাঁত শীঘ্র বাহির হয়। যখন সকল দাঁত সমতল হইয়া যায়, এবং তৃতীয়বার সন্তান দিবার সময় আইসে, তখন গো বা মহিষের পূর্ণ-যৌবন জানিবে। দাঁতগুলি সমতলভাবে কিছুদিন থাকে ও পরে দন্তাগ্রগুলি মাড়ি ছাড়াইয়া উপরে উঠে। কখনও কখনও যৌবন-প্রাপ্তা গাভীর সম্মুখের একটা বা দুইটা দাঁত থাকে না। যে-সকল গাভী পরের মূত্র পান করে, তাহাদেরই এইরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। এই অভ্যাসটা বলদদিগের প্রায়ই দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরীক্ষা-দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, দাঁতটা বয়সের দোষে বা মূত্র-পান-জনিত দোষে পড়িয়া গিয়াছে। গাভীরা দ্বিতীয় প্রসব হইতে পঞ্চম প্রসবকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান থাকে এবং পঞ্চম প্রসবের পর হইতে বিক্রয়কাল-পর্য্যন্ত তাহাদিগের মূল্য কমিয়া যায়। মহিষেরা তৃতীয় প্রসব হইতে ষষ্ঠ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত মূল্যবান থাকে।

যদি গাভী বা মহিষ দূরদেশে ক্রয় করা হয়, তবে তাহাকে রেলযোগে বাটী পাঠানই শ্রেয়ঃ। রেলে পাঠাইতে যে খরচ পড়ে, হাঁটাইয়া পাঠাইতে তদপেক্ষা অধিক খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বনে মন্দ বা বিশৃঙ্খলদোহন-জনিত যে দোষ জন্মে, রেলে পাঠাইলে তাহা ঘটিতে পারে না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, গাভীকে পদব্রজে পাঠাইয়া স্বস্থানে পঁহুছিবার সময় তাহার দুগ্ধ প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রেলে পাঠাইলে গাভীরা সুবিধার সহিত নীত হয় এবং তাহাদিগকে উত্তমরূপে দোহনও করা যাইতে পারে। প্রসবের দুই তিন মাস সময় থাকিলে, গাভীকে হাঁটাইয়া আনা চলে। পদব্রজে যাইবার সময় তাহাদিগকে শুষ্ক ঘাস দিলেই যথেষ্ট হইবে। রেলভাড়া বাঁচাইতে যাইলে অনেক সময় রাস্তায় গাভী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। পদব্রজে পাঠাইলে যে খরচ পড়ে, রেলে পাঠাইলে দুগ্ধ বিক্রয় দ্বারা সে খরচের কতটা উঠিতে পারে; কিন্তু পায়ে হাঁটাইয়া পাঠাইলে সে খরচ উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। রেলে গাভীকে উত্তমরূপে খাইতে দিবে ও দোহন করিবে। এইজন্য গাড়িতে একজন গোয়ালা থাকা আবশ্যক। যদি রেল গাড়িতে গাভী প্রসব করে, তবে তাহাকে সামান্য গুড় খাইতে দিবে এবং সাবধানের সহিত নবদুগ্ধ বাহির করিয়া লইবে; নতুবা স্তনে স্ফীতি বা তাহাতে স্ফোটক হওয়া সম্ভব।

নূতন গাভী ক্রয় করিয়া আনিলে তাহাকে অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ স্বতন্ত্র রাখিবে;—বাটীর অন্যান্য গাভীর সহিত মিশিতে দিবে না। মিশিবার পূর্ব্বে সাবান এবং phenyl (ফিনাইলে)এ অধিক পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া নবাগত গাভীর শরীর ধৌত করিয়া দিবে।

যদি অনেক গরু থাকে, তবে তাহাদিগের শৃঙ্গে দাগ দেওয়া উচিত। প্রত্যেক গাভীর নাম রাখিয়া সেই নাম খাতায় তুলিবে।

গাভী বা মহিষকে দুই প্রকারের খাদ্য

দেওয়া হয়। যথা, (১) চূর্ণ ও (২) চারা। ভুষি, মসীনার খৈল, কার্পাস-বীজ প্রথমটীর অন্তর্গত ; এবং খড়, ঘাস, দেবধান্যের খড়, করবী, (মক্কার গাছ), গাজর, খাঁকড়ি, কাঁচা গম বা জৈ ইত্যাদি দ্বিতীয়টীর অন্তর্গত।

দুগ্ধবতী গাভী, সাধারণতঃ প্রত্যহ নিম্নলিখিত পরিমাণে আহার করিয়া থাকে :—

অড়হর ভুষি (অথবা, ছোলা এবং কলাইয়ের ভুষি) ৬ পাউণ্ড (৩ সের)
মসীনার খৈল ৪ „ (২ সের)
কাঁচা চারা ৪০-৫০ „ (২০ হইতে ২৫ সের)
অথবা শুষ্ক ঘাস ২০ „ (১০ সের)
এতদ্ব্যতীত উত্তম চরাই আবশ্যক।

খৈলকে চূর্ণ করিয়া জলে তিন বা চারি ঘণ্টা ভিজাইয়া দিবে এবং ভুষি ও শস্য তাহাতে মিলাইয়া, কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করণান্তর গাভীকে খাইতে দিবে। জল অধিক দিবে না। যতটা জলে উক্ত পদার্থ মাথ মাথ হয়, ততটাই জল দেওয়াই বিধি। খৈল চূর্ণ না করিলে বা তাহা জলে না আর্দ্র করিলে গাভী খায় না। সুতরাং, তাহাতে ক্ষতি হইয়া থাকে। ভুষি স্বতন্ত্র খাইতে দিবে। কিন্তু খৈল অন্যান্য বস্তুর সহিত খাইতে দেওয়াই বিধি। সমগ্র গাভী বা মহিষগুলিকে প্রতিমাসে প্রায় ২ পাউণ্ড (১ সের) লবণ খাইতে দিবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের খাদ্যের সহিত সামান্য-পরিমাণে লবণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্রীষ্মকালে এবং বর্ষার কয়েক দিবস, যত দিন না ঘাস গজায় ততদিন, কাঁচা চারা খাওয়ানই শ্রেয়ঃ। শুষ্ক ঘাস আহরণ করিতে না পারিলে তৎপরিবর্ত্তে গম, এবং জবের ভুষি মিশ্রিত করিয়া দিবে। শীতকালে তাজা এবং শুষ্ক চারার পরিবর্ত্তন করিবে। গ্রীষ্মকালের দারুণ গ্রীষ্মে কাচা ঘাস যদি পাওয়া যায় তবে ভালই।

চারা-দ্বারা দুগ্ধের পরিমাণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি কাঁচা চারা না দিয়া শুষ্ক চারা দাও, তবে দুগ্ধের পরিমাণ কমিয়া যাইবে—কাঁচা চারা দুগ্ধের বৃদ্ধিকারক। বর্ষাকালে গাভীগুলি কাঁচা চারা খাইলে তাহাদিগের দুগ্ধও নীলাভ হয় এবং তাহা হইতে নবনীত কম উঠিয়া থাকে।

বর্ষা ও শীতকালে প্রত্যহ এক পাউণ্ড (আট ছটাক) কার্পাস-বীজ গাভীকে খাইতে দেওয়া উচিত। তদ্দ্বারা নবনীত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। যদি নবনীত প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা হয়, তবেই কার্পাস-বীজের আবশ্যক ; নতুবা মসীনার খৈল যথেষ্ট।

আহার এরূপ দেওয়া উচিত যাহাতে একদিকে দুগ্ধের মাত্রা অধিক হয় ও অন্যদিকে দুগ্ধের উত্তমতা বজায় থাকে। আব্‌হাওয়া এবং খাদ্যের গুণে দুগ্ধের তারতম্য হইবে বটে, কিন্তু এই বিষয়ে একটা তথ্য-নির্ণয় করা উচিত।

গাভী যদি প্রত্যহ পূর্ণমাত্রায় ১০ কোয়ার্ট অর্থাৎ ১২½ সের দুগ্ধ দেয়, তবে তাহার আহার-হ্রাস করা উচিত নহে। দুগ্ধ কমিয়া গিয়া ৬ কোয়ার্টে (৭½ সের) দাঁড়াইলে আহারের হ্রস্বতা করা বিধেয়। যদি একবারে আহার কমাইয়া দেওয়া হয়, তবে গাভীও একেবারে অদ্ধেক দুগ্ধ দিতে থাকে। যে কোন সময়েই হউক না কেন, আহার কমাইলে দুগ্ধও কমিয়া যাইবে। উক্ত গাভী যখন ৬ বা

৪ কোয়ার্টের (৭½ বা ৫ সের) মধ্যে দুগ্ধ দিবে, তখন তাহার চূর্ণ-খাদ্য অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ তিন পাউণ্ড (১½ সের) এবং ২ পাউণ্ড (১ সের) মসীনার খৈল দেওয়া উচিত, কিন্তু কোন মতেচ্ছাচারার হ্রস্বতা করিবে না। একমাসের জন্ত চূর্ণ খাদ্য দেওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দুগ্ধ অত্যন্ত কমিয়া যাইলে উহা একপক্ষ মাত্র দিবে। এইরূপে যদি ৭০টী পূর্ণদুগ্ধা এবং ২০টী অর্দ্ধদুগ্ধা গাভী থাকে, তবে তন্মধ্যে ৮০টী পূর্ণ মাত্রায় আহার পাইবে মাত্র।

গাভী দুই কোয়ার্ট (২ সের আট ছটাক) বা তদপেক্ষা কম দুগ্ধ দিলে তাহার দুগ্ধ যত শীঘ্র শুষ্ক করিয়া ফেলা হয়, ততই উত্তম। এরূপ করিতে হইলে বিশৃঙ্খল ভাবে অথবা কমবারে দোহন করিতে হইবে। যে-সকল গাভী অতিশয় অল্প দুগ্ধ দেয়, তাহাদিগকে পূর্ণ-মাত্রায় খাইতে না দেওয়াই উচিত। কারণ, তাহার দুগ্ধ-বিক্রয়ে যাহা না আয় হয়, তদপেক্ষা অধিক খরচ করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয়।

পূর্ণদুগ্ধা মহিষী গাভী অপেক্ষা দুই পাউণ্ড (১ সের) চূর্ণ খাদ্য অধিক পাইবে :—

ভুষি ৮ পাউণ্ড (৪ সের)
মসীনার খৈল ৬ „ (৩ সের)

এতদ্ব্যতীত শীতকালে উহারা ২ পাউণ্ড (১ সের) কার্পাস-বীজ অধিক পাইবে। ইহাদিগের দুগ্ধ নবনীত প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে চূর্ণ-খাদ্য দেওয়া বিশেষ আবশ্যক ; কারণ, তদ্দ্বারা দুগ্ধের উৎকর্ষের বৃদ্ধি হয়।

ছোলা এবং এবংবিধ অন্যান্য শস্য দুগ্ধবতী পশুর পক্ষে উপযুক্ত নহে। এ বিষয়টী যেন বিশেষরূপে স্মরণ থাকে। কাঁচা ঘাস ভিন্ন অন্যান্য সকলপ্রকার চারা যেন উত্তমরূপে কাটা হয়। ভুষির অনস্তিত্বে ছোলা দিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহার ফল তত উত্তম হয় না।

খাদ্য ও জল ঠিক্ সময়ে দেওয়া উচিত। আহার দিবার সময় সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা। দুগ্ধ দোহন করিবার অনতিপূর্ব্বেই আহার দেওয়া উচিত। যদি প্রাতঃকালে ৬ টার সময় দোহন করিবার সময় হয়, তবে পাঁচটার সময় পশুকে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। আহার দিবার সময় একবার নির্দ্দিষ্ট হইলে, তাহার যেন কোনক্রমে ভঙ্গ করা না হয়।

সর্ব্বদা আহার দিবার পূর্ব্বে পশুদিগকে জলপান করিতে দিবে। শীতকালে প্রত্যূষে পশুরা সাধারণতঃ জলপান করে না ; কিন্তু তাহাদিগকে জলপান করিবার সুযোগ দিবে। সদ্যঃপ্রসূতা গাভীগুলিকে ঈষদুষ্ণ জল দেওয়াই কর্ত্তব্য ; সম্পূর্ণ শীতল জল দেওয়া নিষিদ্ধ।

বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইতে হইলে পশুকে বিশুদ্ধ জল পান করান উচিত। দূষিত জল পানে দূষিত দুগ্ধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। মহিষের জন্য একটা জলাশয়ের আবশ্যক। তাহারা সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই জলে গিয়া পড়ে।

মহিষশিশু মাতৃদুগ্ধ পান করিলে তাহার উদরে পোকা জন্মিয়া থাকে। যদি ইহার কোন প্রতিবিধান না করা হয়, তবে শিশুর মৃত্যুও হইতে পারে। এ রোগের ঔষধই নিমপাতা। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া অথবা চাপ দ্বারা নিমফল হইতে তৈল নিষ্কাষিত

[illegible] ছটাক হইতে আড়াই ছটাক [illegible] ১২ বা ১৪ দিন অন্তর মহিষশিশুকে খাইতে দিবে। মহিষশিশু বাঁট ধরিবার পূর্ব্বে ইহা খাওয়ান উচিত। বাঁট ধরিবার পরে বা অধিক পূর্ব্বে উক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন ফল দর্শে না। উক্ত ঔষধ দ্বারা মহিষশিশুর দাস্ত হয় এবং তদ্দ্বারা পোকা নির্গত হইয়া যায়। শিশুগুলি যেন নবদুগ্ধ অধিক পান না করে। প্রসবের পর কয়েক দিন-পর্য্যন্ত যে দুগ্ধ বাহির করা হয়, তাহাকে নবদুগ্ধ কহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী দেবী।

মহাশ্মশানে শবের প্রতি।

কোথায় চলেছ তুমি সকলই ত্যজিয়া,
পিতা মাতা দারা সুত, সকলই ছাড়িয়া!
ধন-জন আত্ম-বন্ধু রয়েছে কোথায়!
কোথায় চলেছ আজি, কেবা নিয়ে যায়!
অসার সংসার মাঝে সকলি অসার,
অনিত্য জগতে নহে কেহ আপনার!
কৌপীন-সম্বল চলেছ পথিকবর,
ধীরে ধীরে স্বর্গ-পথ হ'তে অগ্রসর!
চন্দনে চর্চ্চিত তব করিয়াছে কায়,
এসেছে দেবের দূত লইতে তোমায়!
জীবন-নাটক মাঝে এক অভিনেতা,
অনন্ত জগতীখানি তাঁহারি রচিতা!
দীনবন্ধু হরি তিনি পরমদয়াল,
সমভাবে সবারে পালেন্ চিরকাল!
সৃষ্ট এ জগত তাঁর বড়ই সুন্দর,
যে-দিকে ফিরাই আঁখি সবি মোনহর!
রচিতা তাহারি শস্য-পূর্ণা বসুন্ধরা,
মহিমা দেখিয়া সদা হই দিশাহারা!
সুগন্ধ মলয় বহে তাঁরি মহিমায়,
জীবনের স্রোত সম ধীরে বহে যায়!
ফলভারে বৃক্ষগুলি রয়েছে গো নত,
জগদ্-বাসীরে শিক্ষা দিতেছে নিয়ত।
অধমা তনয়া, নাথ, রাখ রাঙা পায়,
আমার জীবন তব পদে হোক্ লয়!
কতকাল রব বিভু তোমাকে ছাড়িয়া?
চিরকাল থাকি যেন তোমাতে মজিয়া!

শ্রীনির্ম্মলা রায়।

শ্মশান।

অঙ্গে ভস্ম মাখি হে শ্মশান,
চিরদিন রহ বর্ত্তমান;
জানাইছ উদাসীন প্রায়—
হে মানব! ভুলো না মায়ায়;
কেহ না রহিবে হেথা হায়!
সকলের সম অবসান!

চিতানল বক্ষোমাঝে ধরি'
দেখাইছ সমাধান করি'—
কেমন সোণার অঙ্গ যায়,
ক্রন্দন রাখিতে নারে তা'য়!
ব্যাকুলতা গুমরে হিয়ায়;
যায় কা'ল নিজ কাজ সারি!

জানাইছ শিবার চীৎকারে,
তটিনীর কুলুকুলু স্বরে—
ধিক্ অর্থে, ধিক্ আকাঙ্ক্ষায়!
সাথে কিছু যাবে না'ক হায়!
রূপগর্ব্ব অঙ্গারে মিশায়!
তুচ্ছ লয়ে কেন মর ঘুরে?

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।